ধর্মকারী
dhormockery নিবেদিত

# ইসলামের অজানা অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

## কুরানে বিগ্যান
ও
## ইসলামঃ উদ্ভট উটের পিঠে

গোলাপ মাহমুদ

ইবুক তৈরি- নরসুন্দর মানুষ

# ইসলামের অজানা অধ্যায়

{প্রথম খণ্ড}

## কুরানে বিগ্যান ও ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে

গোলাপ মাহমুদ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

# ইসলামের অজানা অধ্যায়

{প্রথম খণ্ড}

কুরানে বিগ্যান ও ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে

**গোলাপ মাহমুদ**




## প্রথম প্রকাশ:

জুলাই, ২০১৬ ইংরেজী

## ইবুক তৈরী:

নরসুন্দর মানুষ

## প্রচ্ছদ:

নরসুন্দর মানুষ

## প্রকাশক:

ধর্মকারী
ঢাকা, বাংলাদেশ

**ইমেইল:**
dhormockery@gmail.com

**ওয়েব:**
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

## মূল্য:

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

# উৎসর্গ

“পৃথিবীর সকল মায়ের উদ্দেশে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের 'বিপথগামী' ভেবে আমার মায়ের মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশসহ জগতের সমস্ত মুক্তচিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

# সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে!

# উপক্রমণিকা:

## ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে, সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে, পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে - খবরটি শোনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে, এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুটতরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোনো পরিবার ছিলো না, যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি! যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তারা তো বটেই, যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তারাও। আমি এমন পরিবারও দেখেছি, যে-পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার, কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার-সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যাঁরা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যাঁরা এই কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তাঁরা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন, তা হলো - তাঁরা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান

করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তাঁরা বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জতহানি করেছিলেন। লুটতরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌনদাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে, এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোট ভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাইরে তাঁকে ও তাঁর এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটিকে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাইটি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তাঁর চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদাহাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলামসম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা

প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেনকে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি, যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা হলো, দলে দলে বাঙালিরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলাগাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমনকি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে-দৃশ্য দেখতে পাই, তা হলো - যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙালিরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯ টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাঁকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমরা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।"

আব্বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কি এইভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল।' এটা নিতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মানও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে, তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন, তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাঁকে এও জানালেন যে, অল্প কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু’জনেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু’জনেই মনে-প্রাণে তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী, **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর

আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাঁদের বাসায় ছিলাম, তাঁর সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এতদিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত।" এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে, সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে, যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল, যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান-কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী-পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দু'পক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে-যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের

পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুণগত চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তখন পর্যন্ত আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোনোভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে, তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদবাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে-বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

## লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোনো অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোনো প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক, সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো - বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট

নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোনো ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি।**" ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হননি।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে-মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনোরূপ "political correctness"-এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye cannot see)।" শরীরের কোনো মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে,

যাবার সময় কোনো শাখা বিস্তার করেছে কি না, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে - ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে, তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায়, তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান থাকে, তবে এর উল্টোটি ঘটে।

**বইয়ের কথা:**

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই মূল গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা, তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকি ৫৪০ কোটি ইসলাম-অবিশ্বাসী, যারা

মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনোরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যেভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে **'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান'** আবিষ্কারের একটা ফ্যাশন চালু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে একদল মানুষ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে 'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান' প্রচার করে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মানুষদের প্রতারিত করে চলেছেন। এই অপকর্মে তাঁরা যে-পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তাকে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নমুনা:

***'"জল পড়ে পাতা নড়ে" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের 'ইঙ্গিত!'***

*১) এখানে **"জল"** অর্থে জলের উপাদান 'হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন' বোঝানো হয়েছে। 'বিগ ব্যাং (Big Bang)' এর পরে 'হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম' ছিলো সৃষ্টির আদি অ্যাটম (Atom)। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আদি উপকরণ হলো অ্যাটম। পরবর্তীতে সৃষ্ট অন্যান্য সকল অ্যাটম সৃষ্টি হয়েছে এই 'হাইড্রোজেন' থেকে। আর 'অক্সিজেন' আমাদের বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।*

*২) এখানে **"পড়ে"** অর্থে Gravitational force বোঝানো হয়েছে, যা না হলে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না। গ্রহ সৃষ্টি না হলে কোনো জীবের সৃষ্টি হতো না, আমরাও সৃষ্টি হতাম না। আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের এই ইঙ্গিতটি লেখক কীভাবে জেনেছেন? সত্যিই আশ্চর্য!*

*৩) এখানে **"পাতা"** অর্থে সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বোঝানো হয়েছে, যার ফলে উৎপাদন হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাব হলে আমরা কি বাঁচতে পারতাম? '"জল পড়ে পাতা নড়ে"-এর এক একটি "শব্দ" বিজ্ঞানের এক একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ইঙ্গিত! কী আশ্চর্য!*

*৪) আর **"নড়ে"** এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের দু'টি বিশাল 'ইঙ্গিত'। এখানে নড়ের এক অর্থ হলো 'বায়ু'! বায়ু ছাড়া কি কোনোকিছু নড়ে? নড়ে না। এখানে 'নড়ে' হলো "বায়ু, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ স্পেস!" আর "নড়ে"-এর আরেক অর্থ হলো 'বল (Force)'! যেখানে বায়ু নেই সেখানে কোনো কিছু নড়াতে গেলে লাগে বল। এই 'বল ছাড়া সবকিছু অচল'!*

*কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই **"জল পড়ে পাতা নড়ে"**-এর রচয়িতা একজন নবী (ঈশ্বরের অবতার) ছিলেন। তাইই যদি না হবে, তবে আবিষ্কার হওয়ার আগেই কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের **"ইঙ্গিত"** দিতে পেরেছিলেন?'*

সে কারণেই প্রথম অধ্যায়টির নাম দিয়েছি **'কুরানে বিগ্যান!'** এই অধ্যায়ের নয়টি পর্ব ও পর্ব-১৩ থেকে পাঠকরা কুরানে "বিজ্ঞানের" কিছু নমুনা জেনে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায় - **'ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে!'** এতে সামগ্রিকভাবে কুরান ও তার অ্যানাটমি (Anatomy), ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মুহাম্মদের সাথে কুরাইশদের বাক-বিতণ্ডা,

যুক্তি-প্রতিযুক্তি, মুহাম্মদকে দেয়া তাদের 'চ্যালেঞ্জ', তাদেরকে দেয়া মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর **'মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography)'** অধ্যায় শিরোনামে পরবর্তী একশত তিনটি পর্বে হুদাইবিয়া সন্ধির বিস্তারিত আলোচনা পর্যন্ত মুহাম্মদের মদিনা জীবনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বাকি উপাখ্যান গুলো ধর্মকারীতে আগের মতই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে। মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই তাঁর মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

২০০২ সালে প্রয়াত ডঃ অভিজিৎ রায়ের একটি ছোট্ট ই-মেইল পাই। তিনি কীভাবে আমার ই-মেইল ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন, তা আমি আজও জানি না। তিনি লিখেছিলেন তাঁর গড়া **'মুক্তমনা'** ওয়েব সাইটের কথা ও তার ওয়েব লিংক। বাংলাভাষায় মুক্তমনের মানুষদের লেখা অসংখ্য আর্টিকেলসমৃদ্ধ একটি ওয়েব সাইট, যার হদিস তখন আমার জানা ছিল না। সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ডঃ অভিজিৎ রায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে 'মুক্তমনায়' ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত লেখাগুলোতে আমি ছিলাম নিয়মিত মন্তব্যকারীদের একজন। সে সময় অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন - অভিজিৎ রায়, তামান্না ঝুমু, আবুল কাশেম ভাই, আকাশ মালিক ভাই, সৈকত চৌধুরী, ব্রাইট স্মাইল, কাজী রহমান, আদিল মাহমুদ, রুশদি, ভবঘুরে, সপ্তক ও আরও অনেকে। তাঁদের উৎসাহেই মূলত এ বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই লেখায় যে সমস্ত বইয়ের রেফারেন্স উদ্ধৃত হয়েছে, সেই সমস্ত বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের, যে সমস্ত ওয়েব

সাইটের রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে, সেই লেখকদের এবং যাদের নাম রেফারেন্স হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে - তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি সমস্ত পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, যারা তাঁদের ব্যস্ত জীবনের কিছুটা সময় ব্যয় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি লেখা সম্পূর্ণ করার পর তা ই-বুক আকারে তৈরি করা হবে। ক'দিন আগে একটা ই-মেইল পাই, যা আমাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। ই-মেইলটি যিনি পাঠিয়েছেন তিনি হলেন **"নরসুন্দর মানুষ!"** জানতে পারলাম, গত চারটি বছর তিনি আমার লেখা প্রত্যেকটি পর্ব সযত্নে জমা করে রেখেছেন, বিশেষ অংশগুলো হাইলাইট করেছেন, প্রয়োজনীয় রেফারেন্সগুলো সংরক্ষণ করেছেন - আমার এই লেখার ই-বুক তিনি তৈরি করে দেবেন তাই। তিনি নিজ উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটি চমৎকার প্রচ্ছদসমৃদ্ধ ই-বুক তৈরি করেছেন, যা দেখে আমি মুগ্ধ! তাঁর এই নিষ্ঠা ও ভালবাসার বিনিময় দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

যে-মানুষটির সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তিনি হলেন **"ধর্মপচারক!"** গত চারটি বছর তিনি আমার প্রত্যেকটি লেখার প্রুফ রিড করেছেন, বিভিন্ন সময়ে অনুবাদে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ যুগিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

**গোলাপ মাহমুদ**

জুন ২৬, ২০১৬ সাল

# কুরানে বিগ্যান! ০১: আকাশতত্ত্ব

**করুণাময় আল্লাহ:**

**২২:৬৫-** তিনি - তুমি কি দেখ না যে, -- **তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়।** নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।

**৩৪:৯**- আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা **আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব।** আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

**আল্লাহর কাজে কোনোই খুঁত নাই (তোমরা কি দেখ না):**

**ক) আকাশে কোন ছিদ্র নেই:**

৫০:৬- তারা কি তাদের উপরস্থিত তাদের আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? **তাতে কোন ছিদ্রও নেই।**

**খ) এমন কি কোন ফাটলও নেই!**

৬৭:৩-৫- তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; **কোন ফাটল দেখতে পাও কি?**

**কারণ, তিনি মহাজ্ঞানী:**

ক) ৭৮:১২ –"নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর **মজবুত সপ্ত-আকাশ।**

খ) ২১:৩২ - **আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি-**

(বলেন, সোবহানাল্লাহ)

**কিন্তু যেদিন:**

ক) তা বিদীর্ণ হবে!

৫৫:৩৭, ৮২:১, ৮৪:১ --**যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে**

খ) তাতে বহু দরজা হবে!

*৭৮:১৯ –আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; **তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।**

গ) এমনকি তাতে ছিদ্রও হবে!

৭৭:৯- **যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে,**

তোমরা সে দিনকে ভয় করো! মনে রাখবে, **"এই সেই কিতাব যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই (২:২ )।"**

-আমিন

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০২: আকাশ ও পৃথিবীতত্ত্ব

## করুণাময় আল্লাহ!

## তিনি ভূমিকে করেছেন বিছানা এবং আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ

২১:৩২- **আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ** করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

২:২২- **যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন,** আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে

৪০:৬৪- আল্লাহ, পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, **আকাশকে করেছেন ছাদ** এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক।

৮৮:১৭-২০- তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং **আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে (স্তম্ভ ব্যতীত)?**

এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? **এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?**

হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা কি কখনো পৃথিবীকে গোলাকৃতি দেখতে পাও? আকাশকে কি তোমাদের ছাদের মত মনে হয় না? আল্লাহ কি কখনো ভুল করতে পারেন? আধুনিক ইসলামী পণ্ডিতরা ইদানীং সমতল বিছানকে 'গোলাকার' আখ্যা দেয়। বোঝা যায়, বিজ্ঞান তাদেরকে অজ্ঞান করে ফেলেছে। সমতল বিছানা কখনো গোলাকার হয় না! সে সব পণ্ডিত নিশ্চয়ই গোলাকার বিছানায় ঘুমায় না?

## আল্লাহর অসীম কুদরত!

### ক) তিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ

১৩:২- **আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত।** তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে।

### খ) আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়

৩৫:৪১- **নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।** যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? (বলেন, সোবহানাল্লাহ!)

### গ) তিনি অবাধ্য শয়তান থেকে নিকটবর্তী আকাশকে করেছেন সংরক্ষিত

৬৭:৫- আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; **সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি** এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।

১৫:১৭- **আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।**

৩৭:৬-৭- নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং **তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।**

**ঘ) যে কারণে শয়তানরা**

৩৭:৮-৯- **উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না** এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি।

**কিন্তু, সর্বশক্তিমান আল্লাহর এই দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাকেও শয়তান নস্যাৎ করতে পারে!**

৩৭:১০- **তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।**

১৫:৮- **কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড।**

কোনো কোনো বিশ্বাসী পাঠক হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাকে শয়তান কীভাবে নস্যাৎ করতে পারে! কুরানে গভীর জ্ঞানের অভাব

ও বিশ্বাসের আধিক্যে এমন চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরানের উপরিউক্ত আয়াতগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এরশাদ ফরমাইয়েছেন যে, শয়তানও তাকে মাঝে মাঝে "টেক্কা" দেয়ার সাহস (দু:সাহস!) ও শক্তি রাখে। এই সেই কুরান যা জ্ঞানীদের জন্য পথপ্রদর্শক।

আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এক বিশালাকার "উল্কাপাতের" কারণে ডাইনোসরসহ তৎকালীন পৃথিবীর ৭০ ভাগ প্রাণীর ভয়াবহ মৃত্যু ঘটেছে। কুরানের কোথাও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এ বিষয়ে কোনো আভাসও দেন নেই। তার নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড যদি শয়তানকে আঘাত করতে পারতো, তাহলে সেটা আকাশেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। পৃথিবীতে এসে পড়তো না। খুব সম্ভবতঃ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি "লক্ষ্যভ্রষ্ট" হবার কারণেই তা পৃথিবীতে এসে পড়েছে! যুদ্ধের (আল্লাহ বনাম শয়তান) ভাষায় যার নাম "Collateral damage"। আল্লাহপাক কুরানে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর **যৌন সমস্যা (৩৩:৫০-৫২, ৩৩:৩৭-৩৮, ৩৩:৪) ও পারিবারিক সমস্যার (৩৩:২৮, ৬৬:৩-৫)** প্রয়োজনে একাধিক বাণী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু শয়তানকে শায়েস্তা করতে গিয়ে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ প্রাণীর ভয়াবহ প্রাণ নাশের বিষয়ে কেন তিনি "একটি বাণীও" প্রেরণ করলেন না, এ প্রশ্নটি যে সমস্ত নির্বোধ করেন, তাঁরা ভুলে যান যে-সত্যটি, তা হলো:

৩৩:৫৬- **আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন।** হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।

হ্যাঁ, তাই! নবীর প্রয়োজনের গুরুত্বের কাছে ঐ ধ্বংসলীলা অত্যন্ত তুচ্ছ। তা আদৌ কোন ঘটনায় নয়! তাই আল্লাহ পাক কুরানে তা উল্লেখ করেন নাই। **"-নিশ্চয়ই এতে বোধ শক্তি সম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১৬:১২, ৩:১৯০)"।**

মনে রাখবে, **"এই সেই কিতাব যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই (২:২ )।"**

-আমিন

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৩: ভূ-তত্ব
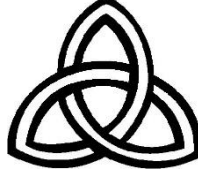
## করুণাময় আল্লাহ !

### ক) তিনি ভুমন্ডলকে করেছেন বিস্তৃত :

১৩:৩- **তিনিই ভুমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন** এবং তাতে পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন।

১৫:১৯- **আমি ভু-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি** এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।

৫০:৭- **আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি,** তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি।

৫১:৪৮- **আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।**

### খ) পৃথিবীকে করেছেন শয্যা :

২০:৫৩- **তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন** এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

৪৩:১০, ৭১:১৯- **যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা** এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

## মহা জ্ঞানী আল্লাহ, নিখুঁত তার সৃষ্টি!

উপরে খুঁটি-হীন আকাশ (ছাদ)। নীচে উত্তমরূপে বিছানো পৃথিবী! মাঝখানে বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির তাণ্ডব, ঝড়, ভূমিকম্প - যা যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীকে (বিছানা) লন্ড-ভণ্ড করে দিতে পারে! উপায়? মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন **পাহাড়-পর্বত! কেন?**

## ক) যেন পৃথিবী স্থির থাকে:

২৭:৬১- বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং **তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন** এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৭৮:৬-৭- আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং **পর্বতমালাকে পেরেক?**

## খ) যেন তা 'তোমাদেরকে' নিয়ে (ভরের আধিক্যে) হেলে-দুলে না পড়ে:

১৬:১৫- এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো **যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে** এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।

## গ) যাতে তা ঝুঁকে না পড়ে:

২১:৩১- আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি **যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে** এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়।

## ঘ) যাতে 'তোমাদেরকে' নিয়ে তা ঢলে না পড়ে:

৩১:১০- তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, **যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে** এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।

## আকাশ ও ভূ-তত্বের সংক্ষিপ্তসার:

মহাজ্ঞানী করুণাময় আল্লাহ মানুষের জন্য **ভূমিকে বিস্তৃত করে পৃথিবীকে করেছেন সমতল বিছানা (৮৮:২০)**। যেমন করে আমরা মেঝেতে কার্পেট বা তোষক বিছায়ে বিছানা তৈরি করি! তিনি তা করেছেন খুবই উত্তমরূপে, "(তিনি) কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম (৫১:৪৮) [বিছানা কখনোই গোলাকৃতি হয় না। আর গোলাকৃতি বস্তুর উপর বিছানা বিস্তারও অসম্ভব!] পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য তিনি **পর্বতমালাকে পেরেক রূপে** তৈরি করেছেন যাতে সে আমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে, ঝুঁকে বা ঢলে না পড়ে।

**তিনি আকাশকে করেছেন মজবুত ছাদ (৭৮:১২) এবং তা স্থাপন করেছেন খুঁটি ব্যতীত (১৩:২, ৩১:১০), যাতে না আছে কোন ছিদ্র (৫০:৬) অথবা ফাটল (৬৭:৫)। তিনি আকাশকে সংরক্ষিত করেছেন প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে "জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের মাধ্যমে",** যাতে শয়তানরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে না পারে (৩৭:৬-৯)।

মনে রাখবে, **'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই (২:২)'।**

**আধুনিক বিজ্ঞান**

আখেরি নবী হযরত **মুহাম্মদ (সা:)এর "দাবীকৃত" অহি-প্রাপ্ত** বাণীর আলোকে কুরানে বিগ্যানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে আকাশ ও ভূ-তত্বের বর্ণনাগুলো পড়ে অবিশ্বাসীরা "হাসি-তামাসা" করে। বলে, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহর বয়ানকৃত তথ্য রূপকথার চেয়েও বেশী উদ্ভট ও বানোয়াট। প্রমাণ, আধুনিক বিজ্ঞানের **প্রমাণ-পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলো:**

১) আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে কী তথ্য দিচ্ছে, তা বিস্তারিত জানা যাবে এই ঠিকানায়: Cosmicevolution-from Big Bang to Humanity

https://www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/splash.html

২) পাহাড় কোন পেরেক নয়। হেলে দুলে বা ঝুঁকে পরার হাত থেকে পৃথিবীকে স্থির রাখার ব্যাপারে পাহাড়ের যে শুধু কোন ভূমিকায় নেয় তাইই নয়, পাহাড় অধ্যুষিত এলাকায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

একটি ছোট্ট ভিডিও- ৫ মিনিট: The Early Earth and Plate Tectonics

http://www.youtube.com/watch?v=QDqskltCixA&feature=endscreen&NR=1

৩) এ ছাড়াও কুরানের দাবীগুলো কেন ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, দেখুন এখানে: লিংক।

http://www.answering-islam.org/authors/vargo/mountains_pegs.html

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৪: মানব-তত্ব
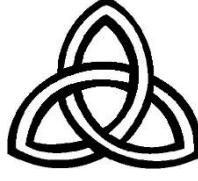
## করুণাময় আল্লাহ!

মানুষের চিন্তা শক্তির উদ্ভবের ঊষালগ্ন থেকেই সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "কোথা থকে সে এসেছে?"

মহা জ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ পবিত্র কুরানে এরশাদ ফরমাইয়েছেন মানুষ সৃষ্টির আদি উৎস।

## কোত্থেকে?

## এক ব্যক্তি (আদম) থেকে:

৪:১- হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, **যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন** এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী--|

৬:৯৮- **তিনিই তোমাদের কে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন|** অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল|

৭:১৮৯- **তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে;** আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে|

৩৯:৬৯- **তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে।** অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন --

## আধুনিক বিজ্ঞান

১) কুরানে যত **"উদ্ভট"**ঘটনার বর্ণনা আছে তার সর্বশ্রেষ্ঠটি হলো আদম-হাওয়ার উপাখ্যান! **বিজ্ঞানে "ব্যক্তি আদমের" কোনো অস্তিত্ব নেই।**

২) প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষসহ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণই **"আদি প্রাণ"** থেকে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। আর সে "আদি প্রাণের" উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন শত কোটি বছর আগে। যে প্রাণটিকে বিজ্ঞান Last Universal Common Ancestor (LUCA) আখ্যা দেয়।

http://en.wikipedia.org/wiki/Last_universal_ancestor

সে কোনো ব্যক্তি ছিল না। তার কোনো সঙ্গিনী ছিল না। সে ছিল অত্যন্ত সাধারণ "এক কোষী" প্রাণ। **তার উদ্ভব হয়েছিল "পানিতে"। কোনো "উদ্যানে" নয়।**

৩) আর কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির Most Recent Common Ancestor (MRCA) বলতে

বোঝানো হয়, সেই প্রজাতির (species) নিকটতম অতীতের সাধারণ পূর্বপুরুষটিকে, যারা দুই বা ততোধিক প্রজাতির নিকটতম সাধারণ পূর্ব-পুরুষ Last Common Ancestor (LCA) থেকে দুটি আলাদা প্রজাতিতে বিবর্তিত। **উদাহরণ, মানুষ ও শিম্পাঞ্জি** তাদের সাধারণ পূর্ব পুরুষ (LCA) থেকে আনুমানিক ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে বিচ্ছিন্ন (mutation) হয়ে দুটি আলাদা প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়েছে। মানুষের DNA ও শিম্পাঞ্জির DNA-এর হুবহু মিল ৯৮.৪ শতাংশ। একজন মানুষের DNA-এর সাথে অনাত্মীয় অন্য একজন মানুষের DNA-এর হুবহু মিল শতকরা ৯৯.৬ শতাংশ। হুবহু

যমজ (Mono zygotic twin) ভাই কিংবা বোনের DNA-এর হুবহু মিল একশত ভাগ। একজন মানুষের DNA-এর সাথে **ইঁদুরের** DNA-এর হুবহু মিল ৮৫ শতাংশ, **কলাগাছের** DNA-এর সাথে ৫০ শতাংশেরও বেশী। অর্থাৎ, একটি জীবনের সাথে আরেকটি জীবনের বংশানুগতিক (Genetic) মিল যত কাছের, তাদের পারস্পরিক DNA-এর হুবহু মিল তত বেশী। শিম্পাঞ্জী মানুষের (Human species) নিকটতম আত্মীয় (মাত্র এক শতাংশ DNA পার্থক্য), ইঁদুর একটু দূরের, কলাগাছ আরও দুরের। পৃথিবীর প্রতিটি "প্রাণ (life)" একই উৎস (LUCA) থেকে বিবর্তিত। আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়।

৪) অনেক ইমানদার পাবলিক ও ধর্মপণ্ডিত মাঝে মাঝে Y-chromosome Adam (Y-MRCA)

http://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Adam

এবং MitochondrialEve-কে

http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve

বাইবেল-কুরানের আদম-হাওয়ার উপাখ্যানের সাথে জুড়ে দিয়ে "অপবিজ্ঞান" প্রচার করার চেষ্টা করে। **বিজ্ঞানীরা Y-chromosomal Adam এবং Mitochondrial Eve (matrilineal-MRCA) বলতে কুরান/বাইবেলের আদম-হাওয়া কে বোঝান না।** তাদের নাম অনুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে মাত্র। Y-MRCA Adam বলতে "একটি মাত্র" মানুষ বোঝানো হয় না। তারা হলেন বর্তমান মানুষ প্রজাতির" **পুরুষ** (Male Ape like Human), যারা অতীতের "মানুষ **এবং** শিম্পাঞ্জি প্রজাতির" সাধারণ পূর্ব-পুরুষ থেকে আলাদা (mutation) হয়ে প্রথম "মানুষ-প্রজাতির" পুরুষের বৈশিষ্ট্যে (male) বিবর্তিত হয়েছে। বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য ব্যাপারটাকে একটু খোলসা করা দরকার। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীর ৫০-১০০ ট্রিলিয়ন কোষের সমষ্টি। এর মাত্র ১০ শতাংশ তার নিজস্ব। বাকি ৯০ শতাংশ বাহিরের (Harboring bacteria)।

নিজস্ব কোষগুলোকে মূলত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়। **Sex cell** (Germ cell) এবং **Somatic Cell** (Body cell)। পুরুষের শুক্রাণু এবং মেয়েদের ডিম্বাণু হলো Sex Cell। বাকি সমস্তই Body Cell। Sex cell এর ক্রোমোসম সংখ্যা **২৩ টি** (Body cell এর ক্রোমোসম সংখ্যা ২৩ জোড়া)। **ডিম্বাণুতে সর্বদাই তা ২২+X (কোন 'Y' নেই)। কিন্তু শুক্রাণুতে তা ২২+X, অথবা "22+Y"।** ডিম্বাণুর মিলন যদি শুক্রানুর ২২+X এর সাথে হয় তাহলে সন্তান হবে "মেয়ে", ডিম্বানুর মিলন শুক্রানুর ২২+Y এর সাথে হলে সন্তান হবে "ছেলে"। **অর্থাৎ "Y" ক্রোমোসমটির উৎস সর্বদাই পুরুষ।** সুতরাং, মানুষ প্রজাতির Y-chromosome এর যাবতীয় পরিবর্তনকে (mutation) অতীতের দিকে অনুসরণ করে (tracing back only along the paternal lines of their family tree) আমরা আদি পিতা Y-MRCA(Y-chromosomal Adam)এর অবস্থানকাল জানতে পারি। বর্তমানের তথ্য অনুযায়ী Y-MRCA Adam এর অবস্থানকাল ছিল এখন থেকে প্রায় ১৪২,০০০ বছর আগের পৃথিবীতে। **একই ভাবে Mitochondrial DNA "শুধু মেয়েদের" কাছ থেকে অক্ষত অবস্থায় পরবর্তী বংশধরদের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ, Mitochondrial DNA এর উৎস সর্বদাই মহিলা।** Y-MRCA Adam এর মত একইভাবে Mitochondrial DNA এর যাবতীয় পরিবর্তনকে (mutation) অতীতের দিকে অনুসরণ করে (tracing back only along the **maternal lines** of their family tree) আমরা আদি মাতা **Mitochondrial Eve** (Female Ape like Human) এর অবস্থানকাল জানতে পারি। বর্তমানের তথ্য অনুযায়ী Mitochondrial Eve অবস্থানকাল ছিল এখন থেকে প্রায় ১৯০,০০০-২০০,০০০ বছর আগের পৃথিবীতে। **সংক্ষেপে,** বিজ্ঞানে নামাঙ্কিত এই Y-MRCA-আদম ও Mitochondrial ইভ:

(১) ধর্ম-গ্রন্থে বর্ণিত আদম-হাওয়া নয়

(২) তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে ৫০,০০০ বছর

(৩) M-ইভ আগে, Y-আদম পরে।

একটি অসাধারণ ভিডিও: What Darwin never Knew

https://www.youtube.com/watch?v=AYBRbCLI4zU

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৫: দেহ-তত্ত্ব
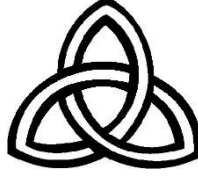
**করুণাময় আল্লাহ!**

**একটি বিশেষ ঘোষণা**

অবিশ্বাসীদের প্রতি **বিশেষ** চ্যালেঞ্জ,
৪:৮২- এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? **পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত-**

কুরানের বাণীর প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু **মুহাম্মদের দাবী-** বাণীগুলো তার নয়, বিশ্ব-স্রষ্টার। যেমন করে অনেক "আধ্যাত্মিক গুরু" দাবী করে যে, তাদের মুখের বাণী তাদের নয়। তাদের ওপর ভর করা আত্মা (Spirit), জ্বিন, ভূত অথবা ঈশ্বরের। আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ও তার ব্যতিক্রম নয়! দাবীর সপক্ষে তার এই বিশেষ ঘোষণাটি **(৪:৮২)!** বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার (যদি থাকেন-Deist view), বাণীতে কখনোই কোনো ভুল, অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব অথবা অসামঞ্জস্য থাকতে পারে না (অসম্ভব প্রস্তাবনা!)। **শুধু "একটি মাত্র বৈপরীত্য"থাকলেই ১০০% সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাবে কুরান বিশ্ব-স্রষ্টার বানী নয়, মুহাম্মদের দাবী মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা মানসিক বিভ্রম (Psychosis)।** 'কুরানে বিগ্যান'-এ সঙ্কলিত বাণীগুলো পর্যবেক্ষণে সত্যানুসন্ধান

সহজতর। হে পাঠক, কোনো "বৈপরীত্য"দেখতে পান কি? মনে রাখবেন, **"একটি মাত্রই যথেষ্ট, দুইটি অতিরিক্ত!"**

মানুষ চিন্তাশীল। জানতে চায় সে সবকিছু। জানতে চায় সে নিজেকে! কোথা থেকে সে এসেছে? কী উপকরণে সে তৈরি? কীভাবে সে সৃষ্টি হলো? **হযরত মুহাম্মদ (সা:) মহাজ্ঞানী আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষ সৃষ্টির উপকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। কী সে উপকরণ?**

**১) মাটি**

৬:২- **তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন,** অত:পর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন| আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে| তথাপি তোমরা সন্দেহ কর|
২০:৫৫- **এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি,** এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব।
**৩০:২০, ৩৮:৭১, ৫৩:৩২, ৭১:১৭ - অনুরূপ বাণী***

কী ধরনের মাটি?

**ক) বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি**
১৫:২৬- **আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।**
৫৫:১৪- তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন **পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।**

**খ) কাদামাটি থেকে**

৩৭:৭-৮- যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং **কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।** অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।

## গ) এঁটেল মাটি থেকে

৩৭:১১- আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? **আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে।**

## ঘ) মাটির সারাংশ

২৩:১২- **আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।**

## ২) পানি

২১:৩০- কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং **প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।** এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

২৫:৫৪- **তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে,** অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।

২৪:৪৫- অনুরূপ বাণী *

## ৩) এক ফোঁটা বীর্য

১৬:৪- **তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন।** এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে গেছে।

৭৬:২- **আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে,** এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

**৩৬:৭৭, ৭৭:২০, ৫৩:৪৫-৪৬, ৮০:১৮-১৯, ৮৬:৫-৭ - অনুরূপ বাণী ***

**৪) মাটি, অতঃপর বীর্য**

১৮:৩৭– তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, **যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে,** অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে?

৩৫:১১- আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন **মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে,** তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে।

চিন্তাশীল মানুষের জ্ঞান পিপাসা লাঘবে আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির উপকরণগুলো কী "চমৎকার" ভাবেই না বর্ণনা করেছেন! **যা খালি চোখে দেখা যায়,** এমন সম্ভাব্য কোনোকিছুই তিনি বাদ রাখেননি! **বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি, কাদামাটি, এঁটেল মাটি, মাটির সারাংশ, পানি, বীর্য, মাটি অতঃপর বীর্য।** বোঝা যায়, পৌত্তলিকরা যেমন করে "মাটি ও পানি" দিয়ে মূর্তি বানায়, আল্লাহও আদমকে ঠিক তেমনি ভাবেই বানিয়েছেন! এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। বিশেষ করে প্রিয় নবীর জন্ম ও বৃদ্ধি যখন পৌত্তলিক পরিবেশেই, তা তার অজানা নয়।! আর **'বীর্য** (Semen)" যে সন্তান উৎপাদনের জন্য অবশ্য, অত্যাবশ্যক তা সর্বজনবিদিত। একমাত্র প্রচণ্ড মানসিক প্রতিবন্ধী (Severely mentally retarded) ও শিশুরা ছাড়া কারুরই তা অজানা নয়। **কিন্তু পুরুষের বীর্যের মত মেয়েদের "ডিম্বাণুও (Ovum)" যে সন্তান উৎপাদনের জন্য অবশ্য অত্যাবশ্যক সে ব্যাপারে মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক "একটি বাক্যও"বর্ষণ করেন নাই!** বীর্যের কথা আল্লাহ

পাক বহুবার ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু বীর্যে **"শুক্রাণুর"অস্তিত্বের বিষয়েও তিনি "একটি বাক্যও" বর্ষণ করেন নাই! কেন?** দু'টি সম্ভাব্য কারণ:

## ১) মৌনতা

হুজুরে পাক (সাঃ) দাবী করেছেন যে, **"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন (৩৩:৫৬)।** " অন্য যে কোনো ব্যক্তি যদি এই একই দাবী নিয়ে হাজির হন, তবে আজকের যে কোনো আধুনিক চিকিৎসক সে ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ **"উন্মাদ** (Psychotic)" [স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) রোগের লক্ষণ] সাব্যস্ত করতো। কিন্তু ধর্ম-শাস্ত্রে এসকল উপসর্গের অধিকারীদের বলা হয় **"কামেল"**। আর মহাকামেল সেই ব্যক্তি, যার এ উপসর্গটি (delusion and hallucination) সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ ও উৎকট।

স্বপ্নকে সত্য জ্ঞানে নিজেরই অবুঝ শিশু পুত্রের গলায় যে নির্দ্বিধায় ছুরি চালাতে পারে (মহানবী ইবরাহীম) অথবা অশরীরী **'জিবরাইলের' মারফত খবর প্রাপ্ত** (বুখারী ৫:৫৯:৪৪৩) হয়ে (visual and auditory Hallucination) দলবল নিয়ে অসহায় ৬০০-৯০০ জন লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে একে একে জবাই করে খুন (বনি কুরাইজা) করতেও যার (মহানবী মুহাম্মদ) একটুও দ্বিধা হয় না, তারা ধর্ম-শাস্ত্রে **'মহাকামেল'** রূপে চিহ্নিত। উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকরা নিরাপত্তার খাতিরে (Psychotic patient may be dangerous for self and others, specially with command hallucination) - এরূপ ব্যক্তিকে এখন জরুরি ভিত্তিতে (psychiatric emergency) মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করেন। অন্যথায় কোনো অঘটন ঘটলে উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশে সেই চিকিৎসককে দিতে হয় প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতিপূরণ (আমেরিকা হলে প্রায় মিলিয়ন ডলারের মামলা), সামলাতে হয় তার মেডিকেল লাইসেন্স বাতিলের ধাক্কা।

**৩৩:৫৬ সাক্ষ্য দেয়, "মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহ পাকের 'সুগভীর প্রেম' "।** প্রেমে পড়লে নাকি জ্ঞানীরা নির্বোধের মত আর নির্বোধরা জ্ঞানীদের মত আচরণ করেন। প্রেমিক-প্রেমিকার **'প্রয়োজনে'** আসে না এমন সংলাপ গুরুত্বহীন হয়ে যায়। সে যাই হোক, সত্য হচ্ছে: দেহ-তত্ত্বের বর্ণনায় আল্লাহ পাক এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে **"মৌনব্রত"** পালন করেছেন। মৌনব্রত পালনের বিশেষ সুবিধা এই যে, অবিশ্বাসীরা এ বিষয়ে যত প্রশ্নই উত্থাপন করুন না কেন, 'আকাশে ফুটা **(৫০:৬)** অথবা ফাটল **(৬৭:৫)** ও পৃথিবীকে পেরেক **(৭৮:৬-৭)** মেরে স্থির" জাতীয় বিষয়ের মত হাসি-তামাসার কোন সুযোগই এখানে নেই!

## ২) অজ্ঞানতা

"ডিম্বাণু ও শুক্রাণু" খালি চোখে দেখা যায় না! আর তা তখন আবিষ্কারও হয়নি। **মানুষের আবিষ্কারের আগে কোনো 'জ্ঞান" ধর্মগ্রন্থে খুঁজে পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।** যা জানা নেই, তা বলা যায় না। সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের কল্পিত আল্লাহ আর যেইই হউন **"বিশ্ব-স্রষ্টা"** নন।

তাহলে? **"নতুন" কী তথ্য আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে যোগ হলো, যা আমাদের জানা ছিল না?** নতুন তথ্যটি এই, **বীর্য কোত্থেকে তৈরি হয়।**

৮৬:৭- **এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।**

What?!

**আধুনিক বিজ্ঞান**

১) বীর্যের উপাদান দু'টি: শুক্রাণু এবং গ্রন্থি-রস। শুক্রাণু তৈরি হয় অণ্ডকোষে (Testes), আর গ্রন্থি-রস নির্গত হয় Prostrate, Seminal Vesicles and bulbourethral gland থেকে। **বীর্য "কখনোই" মেরুদণ্ড (Vertebra) ও বক্ষপাজরের (Rib) মধ্য থেকে নির্গত হয় না।**

**২) মহাবিশ্বের প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুরই আদি উপাদান হলো "পরমাণু (Atom)"। আমাদের শরীর ও এর ব্যতিক্রম নয়।** হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া প্রতিটি পরমাণুই একদা তৈরি হয়েছিল কোনো না কোন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। তারপর সেই নক্ষত্রটির মৃত্যুকালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে (Supernova Explosion) সেই পরমাণুগুলো ছড়িয়ে পরে মহাশূন্যে। তারপর মিলিয়ন-বিলিয়ন বছরে গ্র্যাভিটেশানাল শক্তিতে (Gravitational attraction) সেগুলো আবার একত্রিত হয়ে তৈরি হয় নতুন নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ। আমাদের সবারই "আদি উপাদানের" জন্ম কোনো না কোনো নক্ষত্রে। **We are all star dust (Nuclear waste)।** আমরা সবাই (Everything in this universe) একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই বিশালত্বকে অন্তরে ধারণের অনুভূতির সাথে অন্য কোন অনুভূতিরই তুলনা হতে পারে না! The whole universe is within us and we are within the universe!

একটি ছোট্ট ভিডিও (৪ মিনিট): Stellar nucleosynthesis

http://youtu.be/uKqvjEE0wFg

*** "অনুরূপ বাণী"-**কুরানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যেগুলোর একটি হলো **"পুনরাবৃত্তি।"** একই কথা ইনিয়ে বিনিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, একটু যোগ, একটু বিয়োগ করে বার বার ঘোষণা করা।

***'জিবরাইলের' মারফত খবর:** বুখারী- Volume 5, Book 59, Number 443:

Narrated 'Aisha:

When the Prophet returned from Al-Khandaq (i.e. Trench) and laid down his arms and took a bath, **Gabriel came and said** (to the Prophet ), You have laid down your arms? By Allah, we angels have not laid them down yet. So set out for them." The Prophet said, "Where to go?" Gabriel said, "Towards this side," pointing towards Banu Quraiza. So the Prophet went out towards them.

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৬: ভ্রূণতত্ত্ব

**করুণাময় আল্লাহ!**

তিনি মহাজ্ঞানী! মানুষকে শিখিয়েছেন ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology)। ঘোষণা করেছেন মানুষ সৃষ্টি হয় জমাট রক্ত (Clotted blood) থেকে এবং মাতৃগর্ভে সে ছিল রক্তপিণ্ড!

## জমাট রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি

৯৬:২- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে **জমাট রক্ত থেকে।**
৭৫:৩৬-৩৯- মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর **সে ছিল রক্তপিন্ড**, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।
২২:৫- হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর **জমাট রক্ত থেকে,** এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট **মাংসপিন্ড থেকে,** তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। ---
৪০:৬৭- তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর **জমাট রক্ত দ্বারা,** অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও

এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর।

**মাতৃগর্ভে মানব শিশুর 'পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টিতত্বের" ধারাবিবরণী:**

২৩:১২-১৪- আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে **শুক্রবিন্দু** রূপে এক **সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।** এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে **জমাট রক্তরূপে** সৃষ্টি করেছি, অতঃপর **জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি,** এরপর সেই **মাংসপিন্ড থেকে অস্থি** সৃষ্টি করেছি, অতঃপর **অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি,** অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।

পাঠক, আসুন আমরা "২৩:১২-১৪" কে একটু মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করি। অত:পর, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে তার সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করি।

**প্রথম পর্ব- "শুক্রবিন্দুকে মায়ের পেটে স্থাপন।"** এরপর
**দ্বিতীয় পর্ব- 'শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে পরিবর্তন',** অতঃপর
**তৃতীয় পর্ব- 'জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণতকরণ',** এরপর
**চতুর্থ পর্ব- সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি',** অতঃপর
**পঞ্চম পর্ব- 'অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ',** অবশেষে
**ষষ্ঠ পর্ব- তাকে নতুন রূপে দাঁড় করণ।**

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রফেসার আবুল কাশেম স্যার আমাদেরকে Embryology পড়াতেন। ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিলনের (Fertilization) পর কীভাবে এক-কোষ থেকে কোষ বিভাজন হয়ে ২৭০-২৯০ দিনে এক মানব শিশুর জন্ম হয় তা

তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের শিখিয়েছেন। কুরানের ভ্রূণতত্ত্বের বর্ণনা যে কত **"উদ্ভট ও হাস্যকর"** তা যে কোনো বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি একটু পড়াশুনা করলেই জানতে পারবেন। **কারণ?** বর্তমানের পরীক্ষালব্ধ ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোকে আজ আমরা নিশ্চিত যে:

১) সন্তান জন্মের "সর্বপ্রথম" শর্ত হলো **শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন (Fertilization)।** **এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য অত্যাবশ্যক (absolutely fundamental) তথ্যটিই এখানে অনুপস্থিত!** কেন? কারণটা কি "মৌনতা" নাকি "অজ্ঞতা"? (৫ম পর্ব)।

২) **শুক্রবিন্দু কখনোই (Never)"জমাট রক্ত" রূপে রূপান্তরিত হয় না।** তাই, 'জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করণের' কোনো প্রশ্নই আসে না!

৩) **মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি কখনোই (Never) সৃষ্টি হয় না।** মাংস ও হাড় দুটোরই উৎস "Mesoderm"।

৪) **অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণের কোন প্রশ্নই আসে না।** কারণ, শরীরের প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের উদ্ভব ঘটে Ectoderm, Mesoderm and Endoderm (Germ layer) থেকে সমান্তরালে (Simultaneously)।

**তাহলে? কুরানে ভ্রূণতত্ত্বের এই "উদ্ভট" বর্ণনার উৎস কী?**

**উৎস হলো গর্ভপাত ও সাধারণ প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান।** গর্ভপাতের ফলে যে সকল জরায়ু-অভ্যন্তরস্থ বস্তু নির্গত হয়, তা আপাতঃদৃষ্টিতে **'জমাট রক্ত ও মাংসপিণ্ডই"** মনে হয়। আর মানুষসহ প্রতিটি প্রাণীর গঠনপ্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তার সবচেয়ে ভেতরের অংশে থাকে "অস্থি"। আর সেই অস্থির চারপাশে মাংসপিণ্ডের আবরণ। পর্যবেক্ষণলব্ধ এই জ্ঞানের আলোকে প্রাচীন গ্রীসে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চিকিৎসক **হিপোক্রিটাসই** (Hippocrates) সর্বপ্রথম ভ্রূণতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করেন।

এর অনেক পরে গ্রীসেরই আর এক অত্যন্ত প্রতিভাবান চিকিৎসক, **ডাঃ গ্যালেন** (Galen), ভ্রূণতত্ত্বের ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে। মুহাম্মদের জন্মের ৪২০ বছর পূর্বে। ডা: গ্যালেন তার ভ্রূণ-তত্বে চারটি পর্বের বর্ণনা দেন। সেগুলো হলো:
১) বীর্যরস (Arabic nutfah) সমৃদ্ধ অবস্থা - যা গর্ভপাতের সময় দেখা যায়।
২) রক্ত-মিশ্রিত (Arabic alaqa) মাংসপিণ্ডবৎ অবস্থা। যাতে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থায় স্পষ্ট নয় ("ভ্রূণ")।
৩) বাহু (limbs) ও অন্যান্য অঙ্গের অধিকতর স্পষ্টাবস্থা (Arabic mudghah)।
৪) স্পষ্ট আকৃতি শিশু অবস্থা (Arabic 'a new creation'):
"... The time has come for nature to articulate the organs precisely and to bring all the parts to completion. Thus **it caused flesh to grow on and around all the bones,** and at the same time ... it made at the ends of the bones ligaments that bind them to each other, and along their entire length it placed around them on all sides thin membranes, called periosteal, on which it caused flesh to grow.

ডা: গ্যালেনের ধারণাটি প্রযুক্তিবিহীন সেই সময়ের খালি চোখে পর্যবেক্ষণলব্ধ (nacked eye observation) ভ্রূণতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা। তার ধারণাটি ভুল হলেও বিজ্ঞানে তাঁর এই অবদানকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তিনি কখনোই দাবী করেননি যে, তাঁর ধারণাটি 'ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত'। মুহাম্মদের সময়ে চিকিৎসকরা তাঁর এই ধারণাটির সাথে সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাই, প্রবক্তা মুহাম্মদের পক্ষে তার চারপাশের যে কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে এ ধারণাটি জানা নিতান্তই সম্ভব। যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, নিরক্ষর মুহাম্মদের পক্ষে কোনোভাবেই ডাঃ গ্যালেনের 'ভ্রূণতত্ত্বটি" জানার কোনো সুযোগই ছিল না। "স্বয়ং আল্লাহ" জিবরাইল মারফত ঐশী বাণীর মাধ্যমে মুহাম্মদকে বিশেষভাবে তা শিখিয়েছেন। আর তা

কাকতালীয় ভাবে ডাঃ গ্যালেনের ধারণারই প্রায় হুবহু। সবজান্তা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর নামে প্রবক্তা মুহাম্মদের ভ্রূণতত্ত্ব: **শুক্রাণু স্থাপন > জমাট রক্ত ও মাংসপিণ্ড > হাড্ডি > হাড্ডিকে মাংসপিণ্ড দ্বারা আবৃতকরণ!** **আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে** আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, এই তত্ত্বের একমাত্র সর্বজনবিদিত প্রথম পর্বটি ছাড়া পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্ব এতই অসাড় যে, তাকে "প্রলাপ" ছাড়া আর কোনোভাবে আখ্যায়িত করা যায় না।

সাধারণ মুসলমানদের কুরান ও বিজ্ঞানের অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে অর্থপ্রাপ্তি ও মুসলিম মানসের (প্রায় ১৬০ কোটি পাবলিক) দুর্বলতাকে লক্ষ্যমাত্রায় রেখে কিছু বিদ্বান তাঁদের অসৎ কার্যক্রম চালান। বিভ্রান্ত করেন সাধারণ মুসলমানদের। আর মুসলিম মানস এমনই যে, কোনো মুসলমান যদি মুসলমানদের প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে কিছু লেখেন, তাঁকে অবলীলায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী (প্রবাসী হলে ইহুদীদের চর) আখ্যা দেওয়া হয়। আর কোনো অমুসলিম যদি ইসলামের পক্ষে লেখেন, তবে তিনি হন মুসলিম জগতের "বিখ্যাত হিরো"। "বাইবেল কুরান ও বিজ্ঞান" বইয়ের লেখক ডাঃ মরিস বুকাইলী এবং কানাডিয়ান ডাঃ কীথ মুর সেই হিরোদের অন্যতম। ডাঃ মরিস বুকাইলী তার সে বইতে **"এমন চাপা মারিয়াছেন"** যে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে সেই চাপার প্রতি উত্তরে আরেকটি পুরা বইই রচনা করতে হয়েছে। বাংলায় অনূদিত ডা: ক্যাম্পবেলের সেই বইটির ঠিকানাটি এখানে। আর ডা: মুর? Wall Street Journal এর তত্বাবধানে ২০০২ সালে ডা: মায়ার নামের এক embryologist ডা: মুরের সাথে এ ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকারের আহ্বান জানালে ডা: মুর তা এড়িয়ে যান এই বলে যে, "it's been ten or eleven years since I was involved in the Qur'an."

## আধুনিক বিজ্ঞান

১) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ৪৬ টি ক্রোমোসম বিশিষ্ট "একটি" পূর্নাঙ্গ মানব কোষের (zygote) জন্ম হয় সাধারণত: Fallopian Tube এর ভিতরে।

২) Zygote বিভাজিত (Mitotic cell division) হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি কোষ থেকে দুইটি, দুইটি থেকে চারটি, চারটি থকে আটটি --। একই সাথে তা ক্রমান্বয়ে Fallopian tube এর মধ্য দিয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

৩) তৃতীয় দিনের মাথায় Zygote টি একটি বলিষ্ঠ বলের আকার ধারণ করে (Morula)।

৪) Morula আরও বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে (Blastcyst) সপ্তম দিনের মাথায় জরায়ু আভ্যন্তরীণ দেয়ালে অবস্থান নেয় (Endometrial Implantation)।

৫) **এই Blastcyst এর কোষগুলি দুই স্তরে বিভক্ত থাকে:**

**ক) বাহিরের স্তরের কোষ** (Trophoblast) দিয়ে তৈরি হয় "Placenta" - যার মাধ্যমে মায়ের কাছ থেকে ভ্রূণটি (embryo) পায় পুষ্টি।

**খ) ভিতরের স্তরের কোষগুলো** (Inner Cell Mass) প্রায় দুই সপ্তাহের শেষে তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে তৈরি করে **"সমস্ত দেহ-যন্ত্র"**। এই তিনটি স্তরের নাম: Ectoderm, Mesoderm and Endoderm। **তিনটি স্তরই একই সাথে (Simulatneously) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত** হয়ে ক্রমান্বয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদ্ভব ঘটায়। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা:

*** Ectoderm থেকে উদ্ভব:** ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ড (Central Nervous System) ও অন্যান্য স্নায়ু তন্ত্র, চোখের লেন্স, চামড়ার বাহিরের স্তর (Epidermis), চুল, স্তন-গ্রন্থি (mammary glands)।

*** Mesoderm থেকে উদ্ভব:** অস্থি (Skeleton); অস্থি সংলগ্ন মাংসপেশি (skeletal muscle); চামড়ার ভিতরের স্তর (dermis); মূত্র ও যৌন যন্ত্র (urogenital system);

হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তনালী (Cardiovascular system); কিডনি; এবং প্লীহা (Spleen)।

*** Endoderm থেকে উদ্ভব:** পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্ত (Gastrointestinal system); যকৃত (liver); অগ্নাশয় (pancreas); ফুসফুস (lungs)ও শ্বাস যন্ত্র (Respiratory system); Thyroid and parathyroid glands.

দু'টি প্রাসঙ্গিক ভিডিও। দ্বিতীয়টি অসাধারণ!

১. Human development (আড়াই মিনিট)

http://www.youtube.com/watch?v=UgT5rUQ9EmQ&feature=player_embedded

২. Conception to birth (দশ মিনিট)

http://www.youtube.com/watch?v=fKyljukBE70&feature=player_embedded

**পুনশ্চ: "একটিই যথেষ্ট, দুইটি অতিরিক্ত"**

শুধু "একটি মাত্র" ভুল-অবাস্তব অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যাবে যে কুরান 'বিশ্ব-স্রষ্টার' বাণী হতে পারে না । সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের দাবী মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা মানসিক বিভ্রম (Psychosis)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৭: গোবর-তত্ত্ব
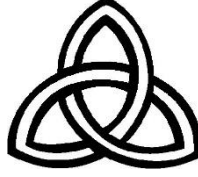
**করুণাময় আল্লাহ!**

মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে, **"চতুষ্পদ জন্তুসমূহের"** মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। তিনি আমাদেরকে তাদের **"উদরস্থিত বস্তু"** থেকে প্রচুর উপকারী দুগ্ধ পান করান। তিনি আরও ঘোষণা দিয়েছেন যে, **দুধ "গোবর" ও রক্ত নিঃসৃত পানীয়!**

## দুধ নিঃসৃত হয় উদরস্থিত বস্তু (Intestinal contents) থেকে:

২৩:২১-- তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে **তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই** এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।

## দুধ নিঃসৃত হয় গোবর ও রক্ত থেকে:

১৬:৬৬-তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। **আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমুহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ** যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়।

পাঠক, আসুন! আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদের ঘোষণাকৃত এই বাণী দু'টিকে আমরা একটু মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করি। **এবং** আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এর সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করি।

**১) দুধ কী "উদরস্থিত বস্তু" থেকে নিঃসৃত? অবশ্যই "না"!**

**২) দুধ কী গোবর (Feces) নিঃসৃত?** আসতাগফেরুল্লাহ! **অবশ্যই নয়!**

চতুষ্পদ জন্তুদের **স্তন** (Breast) যে উদরের উপরিভাগে থাকে, এ তথ্যটি জগতের সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই দেখতে পান। আর **"গোবর"** যে এই উদর থেকেই নির্গত হয় তাও চক্ষুষ্মানদের অজানা নয়। কিন্তু, যা দেখা যায় না তা হলো চামড়ার নীচে স্তন-গ্রন্থির অস্তিত্ব। তাই, **স্তন-গ্রন্থির অস্তিত্ব, অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা না থাকা যে কোন ব্যক্তিই দুধকে (Milk) উদরস্থিত গোবর ও রক্ত মিশ্রিত বস্তু জ্ঞানে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।** উদরস্থিত পাকস্থলী, অন্ত্র এবং তাদের মধ্যস্থিত বস্তু সামগ্রীর (গোবর) সাথে স্তন-গ্রন্থি যে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বোঝার কোনো উপায় নেই। সেকালে মুহাম্মদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলস্বরূপ, আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদ যা প্রচার করেছেন, তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে **"প্রলাপ"** ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না!

## আধুনিক বিজ্ঞান

১) দুধ তৈরি হয় স্তন-গ্রন্থিতে। **উদরে নয়!** সকল দুগ্ধজাত প্রাণীর (Mammal) সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই স্তন-গ্রন্থি। এর অবস্থান প্রাণীভেদে বিভিন্ন হলেও কখনোই তা Mammary line এর বাহিরে নয়। মানুষসহ অন্যান্য প্রাইমেটের (Primate) ক্ষেত্রে এর অবস্থান হলো বুকের চামড়া সংলগ্ন। আর ক্ষুরযুক্ত চতুষ্পদ জন্তুদের (Ungulates) ক্ষেত্রে এর অবস্থান তাদের পিছনের দুই পায়ের সামনে পেটের শেষভাগের চামড়া সংলগ্ন।

২) বাহ্যিক অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, **স্তন-গ্রন্থি কক্ষনোই (Never) কোনোভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্র (উদর) এবং উদরস্থিত বস্তু সামগ্রীর (গোবর-feces) সাথে সম্পৃক্ত নয়।** ভ্রূণের একদম প্রাথমিক স্তর থেকেই এ দুটি দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন Germ layer থেকে বেড়ে ওঠে (ষষ্ঠ পর্ব)। Their Embryological development is completely different.

**ক) স্তন-গ্রন্থির সম্পর্ক চামড়ার (Skin) সাথে।** এর প্রাথমিক উৎপত্তিস্থল চামড়ার মতই মূলত: **"Ectoderm"** । কিছু অংশ Mesoderm থেকে।

**খ) অন্যদিকে উদরের (পাকস্থলী ও অন্ত্র) সম্পর্ক খাদ্য নালীর সাথে।** মুখ থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত (From mouth to anus)। এর প্রাথমিক উৎপত্তিস্থল হলো **"Endoderm"।**

৩) স্তন-গ্রন্থির অস্তিত্ব এবং দুধের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকা কোনো ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কে কক্ষনোই ঘোষণা দেবেন না যে, "দুধ গোবর নিঃসৃত পানীয়"। "গোবরের" সাথে দুধের প্রস্তুত প্রণালীর কোনোই সংস্রব নেই"।

**পুনশ্চ: "একটিই যথেষ্ট, দুইটি অতিরিক্ত"**

শুধু "একটি মাত্র" ভুল, অবাস্তবতা অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিতভাবেই বলা যাবে যে, কুরান 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী হতে পারে না। সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের দাবী মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা মানসিক বিভ্রম (Psychosis)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৮: কসম-তত্ত্ব
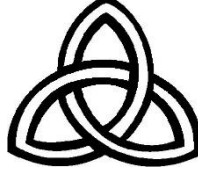
## করুণাময় আল্লাহ!

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার মক্কা-জীবনে আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কী পরিমাণ কসম কেটেছেন ও শপথ করেছেন, তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই অবহিত নয়। তার দাবী, **আল্লাহ মানুষের মতই "কসম কাটেন, শপথ করেন।"** কসম যে কত বিচিত্র ভাবে করা যায়, তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। অল্প কিছু উদাহরণ:

## কসম

৫১:১-৪,৭- কসম **ঝঞ্ঝাবায়ুর**। অতঃপর বোঝা বহনকারী **মেঘের**। অতঃপর মৃদু চলমান **জলযানের**, অতঃপর কর্ম বন্টনকারী **ফেরেশতাগণের**। - পথবিশিষ্ট **আকাশের** কসম

৫২:১-৬- কসম **তূরপর্বতের**, এবং লিখিত **কিতাবের,** প্রশস্ত পত্রে, কসম **বায়তুল-মামুর** তথা আবাদ গৃহের, এবং সমুন্নত **ছাদের**, এবং উত্তাল **সমুদ্রের**,

৫৩:১- **নক্ষত্রের** কসম, যখন অস্তমিত হয়।

১০৩:১- কসম **যুগের** (সময়ের),

## শপথ

৪৪:২- শপথ সুস্পষ্ট **কিতাবের**

৫০:১- সম্মানিত **কোরআনের** শপথ

৫৬:৭৫- অতএব, আমি **তারকারাজির** অস্তাচলের শপথ করছি,

৬৮:১- শপথ **কলমের** এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে,

৭৪:৩৩-৩৪- শপথ **রাত্রির** যখন তার অবসান হয়, শপথ **প্রভাতকালের** যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,

৭৫:১-২- আমি শপথ করি **কেয়ামত দিবসের,** আরও শপথ করি সেই **মনের,** যে নিজেকে ধিক্কার দেয়-

৭৭:১-৫- কল্যাণের জন্যে প্রেরিত **বায়ুর** শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, মেঘবিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং ওহী নিয়ে অবতরণকারী **ফেরেশতাগণের** শপথ-

৭৯:১-৫- শপথ সেই **ফেরেশতাগণের,** যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে; শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং শপথ তাদের, যারা সকল কর্মনির্বাহ করে, কেয়ামত অবশ্যই হবে।

৮১: ১৫-১৮- আমি শপথ করি যেসব **নক্ষত্রগুলো** পশ্চাতে সরে যায়।-- **শপথ নিশাবসান ও প্রভাত** আগমন কালের,

৮৪: ১৬-১৮ - আমি শপথ করি **সন্ধ্যাকালীন লাল আভার** এবং **রাত্রির,** এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে এবং **চন্দ্রের**, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে

৮৫:১-৩- শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত **আকাশের,** এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়

৮৬:১, ১১-১২- শপথ আকাশের এবং **রাত্রিতে আগমনকারীর।** - শপথ **চক্রশীল আকাশের** এবং বিদারনশীল **পৃথিবীর**

৮৯:১-৪- শপথ **ফজরের,** শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, যা **জোড় ও যা বিজোড়** এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে

৯০:১-৩- আমি এই **নগরীর** শপথ করি ।- শপথ **জনকের** ও যা জন্ম দেয়।

৯২:১-৩- শপথ **রাত্রির**, যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ **দিনের,** যখন সে আলোকিত হয় এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন,

৯৩:১-২- শপথ **পূর্বাহ্নের**, শপথ **রাত্রির** যখন তা গভীর হয়,

৯৫:১-৩ - শপথ **আঞ্জীর (ডুমুর)** ও **যয়তুনের**, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ **তূর পর্বতের** এবং এই নিরাপদ **নগরীর।**

১০০:১-৫- শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান **অশ্বসমূহের,** অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের, অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে, অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে-

## আল্লাহ "নিজেই নিজের কসম কাটেন"!

৫১:২৩- নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের **পালনকর্তার** কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

৭০:৪০- আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের **পালনকর্তার**, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম!

৯১:৫-৭- শপথ আকাশের এবং **যিনি তা নির্মাণ করেছেন,** তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং **যিনি তা বিস্তৃত করেছেন,** তাঁর, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর,

৯২:৩- (শপথ)-এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী **সৃষ্টি করেছেন,**

পাঠক, দেখতেই পাচ্ছেন! মুহাম্মদ তার আল্লার উদ্ধৃতি দিয়ে অসংখ্য "কসম ও শপথ" বাক্য উচ্চারণ করেছেন। কেন?

## কসম কি সত্যবাদিতার পরিচয়?

একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন, **"মানুষ কেন কসম কাটে?" কিসের প্রয়োজনে?** যে ব্যক্তিকে তার চারপাশের মানুষ সত্যবাদী, সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে জানে ও মানে (সম্মান করে),

তাকে কখনোই "কসমের আশ্রয়" নিয়ে তার বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় না। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ যখন কোনো ব্যক্তির বক্তব্য ও কাজে ভরসা রাখতে পারেন না, তখনই সেই ব্যক্তি প্রতিপক্ষের কাছে "বিশ্বাসযোগ্যতা" পাবার অভিপ্রায়ে "কসমের আশ্রয়" নেন। অর্থাৎ, যে মানুষ অহরহ মিথ্যা বলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং যার প্রতি অন্য মানুষের কোন আস্থা নেই এমন একজন **সর্বজনবিদিত মিথ্যুক-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মানুষকে যখন কেউ বিশ্বাস করেন না, তখনই সেই ব্যক্তিটি গ্রহণযোগ্যতা পাবার অভিপ্রায়ে তার পরিচিতজনদের কাছে 'কসম বাক্য' উচ্চারণে বাধ্য হয়! প্রয়োজনই তাকে তা করতে বাধ্য করে!** It is an act of desperation.

সুতরাং, একজন চিন্তাশীল মানুষ গুরুত্বপূর্ণ যে-প্রশ্নটি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই করতে পারেন, তা হলো যিনি ৯৩০০ কোটি **আলোক-বর্ষ*** পরিবৃত এই বিশাল ও চমকপ্রদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (কুড়ি মিনিটের ভিডিও) সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকেন)। যিনি বর্তমান পৃথিবীর দৃশ্যমান জীবিত (পৃথিবীর ৯৯ শতাংশ প্রাণই আজ অবলুপ্ত) ১৭ লক্ষাধিক প্রজাতির (গৃহপালিত পশু ও এক কোষী প্রাণ এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নয়) সৃষ্টিকর্তা। তিনি কি আদৌ কসম কাটেন? সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন? তাহলে? **মুহাম্মদ কেন তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে এত অসংখ্য 'কসম ও শপথ' বাক্য উচ্চারণ করেছেন?** লক্ষণীয় বিষয়, **মুহাম্মদের যাবতীয় কসম ও শপথ তার 'মক্কা- জীবনে' (৫৭০-৬২২), যখন তিনি ছিলেন ধনে-মানে-জনে সবচেয়ে দুর্বল।** মক্কায় তার ১৩ বছরের (৬১০-৬২২) নবী জীবনের অর্জন সর্বোচ্চ ১২০-১৩০ জন অনুসারী। যাদের প্রায় সকলেই সমাজে নিম্নশ্রেণীভুক্ত। তিনি সর্বজনবিদিত সৎ, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ আস্থাভাজন মানুষ ছিলেন বলে যে দাবী করা হয়, সে দাবীর সত্যতা কতটুকু? তিনি এমন গুণবান হলে নিশ্চয়ই তাকে এসকল 'কসম-বাক্যের' দ্বারস্থ হতে হতো না!

## শক্তিমত্তায় কি 'সত্যবাদিতার' প্রমাণ?

মুহাম্মদ তার পরবর্তী দশ বছরের মদিনা জীবনে (৬২২-৬৩২) "একটিও" কসম ও শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন বলে জানা যায় না! প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিভিন্ন ছল-চাতুরী, ডাকাতি, ভূমি দখল ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মদিনাতে মুহাম্মদ তার সহচরদের সহায়তায় নিজেকে "শক্তিধর" প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। "কসমের" পরিবর্তে মুহাম্মদ তখন জেহাদের নামে প্রয়োজনমত সন্ত্রাস ও **লুটপাটের "ঐশী বাণী"** হাজির করতেন। আর তার "যমদূত" বাহিনী সেই বাণী করতেন কার্যকর। বিশিষ্ট প্রাচীন মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ তার মদিনা জীবনে ৬০ টিরও বেশী যুদ্ধ/সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। গড়ে ৬-৮ সপ্তাহে একটি। প্রথমাবস্থায় তা ছিলো রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত চোরাগোপ্তা হামলা অর্থাৎ ডাকাতি। তাদের মালামাল লুণ্ঠন, আরোহীদের হত্যা অথবা অপহরণ করে তাদের পরিবার-প্রিয়জনদের কাছে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া। **প্রথমাবস্থায় এটাই ছিল মদিনায় মুহাম্মদ ও তার বাহিনীর প্রধান জীবিকা! আল্লাহর নামে মুহাম্মদের পেশাদার ডাকাত বাহিনী।** পরবর্তীতে শক্তি বাড়ার সাথে সাথে এ হামলার পরিসর বৃদ্ধি করে প্রথমে **ইহুদী জনবসতি** ও পরবর্তীতে সমস্ত অমুসলিম জনপদের ওপর হামলা। তাদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন, সম্পত্তি দখল, ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ, ত্রাস-খুন অথবা দাসত্বের শৃঙ্খলে মুক্ত মানুষকে বন্দী করে দাসপ্রথার প্রসার। প্রতিটি সাহাবির হামলায় শরিক হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তারাও তা করতেন মরলে বেহেস্ত সুখ ও হুরী-সম্ভোগ, বাঁচলে গণিমতের মাল-দাস মালিক-দাসী সম্ভোগের "ঐশী প্রলোভনে।" যুদ্ধ ও সংঘর্ষে হস্তগত গনিমতের মালের হিস্যা: এক-পঞ্চমাংশ মুহাম্মদের, বাকি চার-পঞ্চমাংশ অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের **(সুরা আনফাল-৮:৪১)**। যুদ্ধ-ছাড়া ত্রাস-হুমকি-ভীতি প্রদর্শনে হস্তগত "মাল" আল্লাহ ও মুহাম্মদের **(সুরা হাশর: ৫৯:৬-৭)**। লুটের মালের হিস্যা কি "আল্লাহ" নেন? পুরোটাই মুহাম্মদ ও তার পরিবারের। **মুহাম্মদ ও তার যমদূত বাহিনী কিভাবে এই সন্ত্রাসী নবযাত্রা শুরু করেছিলেন তার প্রাণবন্ত (vivid) বর্ণনা আদি মুসলিম**

**ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন।** ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি ইতিহাসবিদদের মতে এই বিশাল সংখ্যক যুদ্ধের মাত্র দুটি (ওহুদ ও খন্দক) ছাড়া আর সবগুলোই ছিলো অমুসলিম জনপদের উপর মুহাম্মদের অতর্কিত হামলা। **সত্য হচ্ছে,** এই ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধেরও প্রকৃত কারণ - মুহাম্মদের সন্ত্রাসী (বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলায় ডাকাতি) আক্রমণে অতিষ্ঠ কুরাইশদের প্রতি-হামলা। কিন্তু আক্রমণকারী মুহাম্মদ সর্বদাই নিজেকে “মহান ও নির্দোষ" দাবী করতেন। দোষ চাপাতেন আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে। কারণ তারা “মহান” মুহাম্মদ ও তার আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করে না! তাকে "মহান-সত্যবাদী-দয়ালু" বলে স্বীকার না করার শাস্তি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ! তার শক্তিমত্তাই কি তার 'সত্যবাদিতার' প্রমাণ?!

## মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন?

তাই যে-প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, “মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন?” কুরান সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মদ তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেই নিজের গুণকীর্তন করেছেন অসংখ্য বার । ভয়-ভীতি-লোভ প্রদর্শন করে তার অনুসারীদেরকে বাধ্য করেছেন "তার গুণকীর্তন”করতে। কী ধরনের লোক এমনটি করে থাকে? এ সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়, তার নিজেরই জবানবন্দীতে। **তাঁর পরিচিতজনেরা তাঁকে জানতেন 'মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক, মানসিক বিকারগ্রস্ত' রূপে।** এমত পরিস্থিতিতে মক্কায় ধনে-মানে-জনে দুর্বল মুহাম্মদ পরিচিতজনদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজনে অসংখ্য “কসম ও শপথ” বাক্যের আশ্রয় ছাড়া আর কী উপায় অবলম্বন করতে পারতেন? "কসম বাক্য" প্রয়োগের প্রয়োজন মুহাম্মদেরই। সৃষ্টিকর্তার নয়।

## সর্বজনীন সদুপদেশ

জগতে আর কোনো ব্যক্তি মুহাম্মদের চেয়ে সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে এত অধিক কসম ও শপথ করেছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে নাই। সেই একই ব্যক্তি (আল্লাহ!) ঘোষনা করেছেন,

৬৮:১০- **যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।**

যদিও মুহাম্মদ এই "সতর্কবাক্যটি" তার প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছিলেন, তথাপি মানতেই হবে যে, কুরানে যে **"যৎকিঞ্চিত"** সর্বজনীন ভাল উপদেশ বাক্য আছে, **৬৮:১০** তারই একটি। **যে ব্যক্তি অধিক কসম ও শপথ করে সে "সন্দেহ ভাজন"**। ইসলামবিশ্বাসীরা এমনি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গত ১৪০০ বছর ধরে অনুসরণ করে আসছেন। ফলাফল, আজ মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বনিম্ন। **বিভ্রান্ত লোকেরাই এরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করে সফলতার আশা রাখে।**

* এক আলোক-বর্ষ = ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল (ছয় শত হাজার কোটি মাইল)

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# কুরানে বিগ্যান! ০৯: পানি-চক্র তত্ত্ব

**করুণাময় আল্লাহ!**

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)মহা জ্ঞানী আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে কুরানে "মেঘ-বৃষ্টি-বায়ু" সংক্রান্ত এমন কিছু বাণী বর্ষণ করেছেন, যেগুলোকে ইসলামী পণ্ডিতরা আধুনিক বিজ্ঞানের **'পানি-চক্রের'** নিখুঁত বর্ণনা বলে অভিহিত করেন। **কী সেই বাণী?** কিছু উদাহরণ:

## ১) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ: অতঃপর সেই পানিতে,

### ক) মৃত যমীন হয় সজীব

২:১৬৪- নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, **তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব** করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

৩৫:৯- আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে **ভূ-খন্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই।** এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।

৪৫:৫- দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর **পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন,** তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

## খ) উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ, সবুজ ফসল ও ফল:

৬:৯৯- তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা **সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি,** অতঃপর আমি এ থেকে **সবুজ ফসল** নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন **গাছের ফলের** প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।

৫০:৯-১১- আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা **বাগান ও শস্য উদগত করি,** যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়। এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

## গ) জমিনে সংরক্ষণ ও অপসারণ

২৩:১৮-১৯- আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি **জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।** অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।

## ঘ) ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত

৩৯:২১- তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর **সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন,** এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

## ঙ) স্রোতধারা প্রবাহিত যা ‘ফেনারাশি’উপরে নিয়ে আসে

১৩:১৭- তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর **স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে** নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর **স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে।** এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনি ভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন

## চ) "তোমরা কর পান”

১৫:২২ - আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর **তোমাদেরকে তা পান করাই।** বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।

৫৬:৬৮-৭০- তোমরা যে পানি **পান কর**, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষন করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

## ২) বায়ুরাশি মেঘমালা বয়ে আনে: অতঃপর,

### ক) "মেঘমালা"পুঞ্জীভূত হয় স্তরে স্তরে,

৩০:৪৮- তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি **মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন।** এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়।

### খ) সেখান থেকে হয় শিলা বর্ষণ

২৪:৪৩- তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর **তাকে পুঞ্জীভূত করেন,** অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি **আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন** এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।

## গ) বায়ু ও বৃষ্টি বর্ষণ

৭:৫৭- তিনিই **বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু** পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ **মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি।** অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে মৃতদেরকে বের করব-যাতে তোমরা চিন্তা কর।

## ঘ) এবং চমকায় বিদ্যুৎ

৩০:২৪- তাঁর আরও নিদর্শনঃ তিনি তোমাদেরকে **দেখান বিদ্যুৎ,** ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

## মুহাম্মদের "পানি-চক্র" তত্বের সংক্ষিপ্তসার:

**১) মেঘমালা স্তরে স্তরে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে। বাতাসের প্রকোপে তা ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমক।**

**২) বৃষ্টির পানি জমিনে হয় সংরক্ষণ, প্রবাহিত করে ঝর্ণাধারা ও ফেনায়িত স্রোতধারা। তদ্বারা আমরা পান করি, সজীব হয় শুষ্ক জমিন, উৎপন্ন হয় ফসল-ফল ও উদ্ভিদ।**

পাঠক, একটু মনোযোগের সাথে ওপরের বর্ণনাগুলো খেয়াল করুন। এখানে এমন কোনো নতুন "তথ্য" কি আপনি খুঁজে পাচ্ছেন, যা আপনি জানতেন না, দেখেন নি কিংবা শোনেন নি?

মুহাম্মদের এ বর্ণনা সাধারণ মানুষের খালি চোখে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে **"মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় ও বৃষ্টি পরবর্তী প্রকৃতির বর্ণনা"** ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে কোনো "তত্ত্বকথা" লুকিয়ে নেই! নেই কোনো নতুন "জ্ঞান কিংবা তথ্য"! জগতের প্রথম 'বৃষ্টিপাত' কি মুহাম্মদের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে? মেঘ যে আসমান ও যমীনের মাঝখানে স্তরে স্তরে থাকে তা কার অজানা? বায়ুপ্রবাহ মেঘকে আকাশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায়, তা একমাত্র জন্মান্ধরা ছাড়া আর কে দেখে নি? কিংবা দেখে নি মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমক? অথবা বৃষ্টিপাতের আগে বাতাসের আবির্ভাব? বৃষ্টির পানিতে যমীন হয় সজীব, ফসল-ফুল ও ফলে ভরে ওঠে মাঠ, এ তথ্য কি নতুন? নিশ্চয়ই নয়। **এমন কোনো তথ্য এখানে নেই, যা অনাদিকাল থেকে পৃথিবীর প্রতিটি চক্ষুষ্মান মানুষ অহরহ প্রত্যক্ষ করে না!** জগতের প্রতিটি মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে মৃত্যুকাল অবধি "প্রকৃতির এ রূপ" অহরহ প্রত্যক্ষ করে আসছেন। "মহা জ্ঞানী বক্তা মশায়" নিদেনপক্ষে এটুকুও যদি জানাতেন,

**১) মেঘের পানির আদি উৎসটি কী?** মানব জাতি আলোকিত হতো বাষ্পের অস্তিত্ব ও বাষ্পীভবন (Evaporation) পদ্ধতির জ্ঞানপ্রাপ্তিতে।

অথবা জানাতেন,

**২) মেঘটা আসলে কী এবং কেমনে তা 'পানি-পূর্ণ'"?** আমরা কৃতার্থ হতাম ঘনীভবন (Condensation) পদ্ধতির সন্ধান জেনে।

না। মুহাম্মদের বর্ণনায় এমন কোনোকিছুর "অস্তিত্ব" নেই। তথাপি ইসলামী পণ্ডিতরা "এর" মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞানের "পানি-চক্র (Water cycle)" আবিষ্কার করে

ফেলেছেন! পানি চক্র সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকা ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, **পানি চক্রের অত্যাবশ্যকীয় (absolutely fundamental) দু'টি উপাদান হচ্ছে "সূর্য ও সমুদ্র"। পানি চক্রের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে 'সূর্য (Solar radiation')। এই চক্রের নব্বই শতাংশ বাষ্পীভূত পানির (evaporated water) উৎস হচ্ছে "সমুদ্র"। মুহাম্মদের 'মেঘ-বৃষ্টির' বর্ণনায় এই দুটি 'অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের" কোনো উল্লেখই নেই! উল্লেখ নেই পানি চক্রের অত্যাবশ্যকীয় "বাষ্পীভবন-ঘনীভবন" সহ অন্যান্য প্রক্রিয়ার (নিচের ছবি) সামান্যতম আভাস!**

কেন নেই? **কারণ, বাষ্প খালি চোকে দেখা যায় না।** পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা-সমুদ্র থেকে অনবরত পানি বাষ্প হয়ে বায়ু-মণ্ডলে জমা হচ্ছে। তা কি কেউ দেখতে পান কিংবা অনুভব করেন? মুহাম্মদেরও তা জানা ছিল না। আর তখন তা আবিষ্কৃতও হয় নি। মুহাম্মদ তা উল্লেখ করবেন কী করে?

যে কারণে "ভ্রূণ-তত্বে" বীর্য আছে, ডিম্বাণু নেই; সেই একই কারণে মুহাম্মদের এ বর্ণনায় মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-বায়ু সহ যা কিছু খালি চোখে দেখা ও অনুভব করা যায় তার সবই আছে, "বাষ্প নেই"! আর সূর্য? **বৃষ্টিপাতের সময়ে যে সূর্যকে দেখায় যায় না, সেই সূর্যই যে "মেঘ-বৃষ্টি-বায়ু চক্রের" অত্যাবশ্যকীয় চালিকা শক্তি তা সে সময়ে কারও পক্ষে "কল্পনাতে" আনাও সম্ভব ছিল না। "কুরানের বক্তাও" তার ব্যতিক্রম নয়, তা তার বর্ণনায় স্পষ্ট।** সূর্য আলো দেয়, তাপ বিতরণ করে। দিনের বেলায় তাকে দেখা যায়, রাতের বেলা তাকে দেখা যায় না। দিন রাত্রির মধ্যে আর রাত্রি দিনের মধ্যে ঢুকে যায়- এ সমস্ত সর্বজনবিদিত "খেজুরে বাক্যালাপ" কুরানে বহুবার বহুভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হয়েছে।

কিন্তু মুহাম্মদের সময়ে অনাবিষ্কৃত এবং খালি চোখে অদৃষ্ট এমন কোনোকিছুর উল্লেখ কুরানের কোথাও নেই। **"কারণ "অজ্ঞতা"**। যা জানা নাই, তা বলা যায় না। **কুরানের বক্তা মশায় যখনি এ সকল "অজানা তথ্য" বলতে গেছেন, তখনই বেধেছে "গোল"।** আকাশের বর্ণনায় এসেছে "মজবুত ছাদ, ফুটা ও ফাটল, উল্কা-পিণ্ড শয়তান মারার যন্ত্র"। পৃথিবীর বর্ণনায় এসেছে, "উত্তমরূপে বিছানো বিছানা আর পাহাড়ের পেরেকে তাকে স্থির রাখার ব্যবস্থা"। "গোবর মিশ্রিত দুধ" - ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্বজনবিদিত সাধারণ জ্ঞানের সাথে "আল্লাহ" অনুষঙ্গটি জায়গা মত জুড়ে দিয়ে **"ঐশী ধুম্রজাল"** তৈরি করে বিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করা যায়। জ্ঞানের কোনো উন্নতি হয় না।

এতদসত্বেও ইসলামী পণ্ডিতরা মুহাম্মদের এই সরল 'মেঘ-বৃষ্টির' বর্ণনায় "পানি চক্র" স্পষ্ট অনুভব করেন (Delusion)। যে সকল পণ্ডিত মশায় শুক্রাণু-ডিম্বাণুর মিলনের (Fertilization) উপস্থিতি ছাড়ায় শুক্রাণুকে জমাট রক্তে পরিবর্তন করেও "ভ্রূণ-তত্ব(Embryology)" আবিষ্কার করতে পারেন (ষষ্ঠ পর্ব), আকাশে ফাটল ও ছিদ্র নিয়েও "আকাশ-তত্ব (Cosmology)" আবিষ্কার করেন (১ম ও ২য় পর্ব), তাদের জন্য সূর্য ও সমুদ্রের উপস্থিতি ছাড়াই "পানি চক্র" আবিষ্কার যে অত্যন্ত সহজ, তা বলাই বাহুল্য। প্রয়োজন চাপাবাজি, চতুরতা আর প্রয়োজনীয় **"cut and paste"** এর ব্যবহার। "সূর্য ও সমুদ্রের" উল্লেখ নেই, তো কী হয়েছে? কুরানের যেখানেই 'সূর্য ও সমুদ্রের" বর্ণনা আছে সেখান থাকে প্রয়োজনীয় অংশটা "Cut" করে এখানে জায়গা মত "paste" করে দিলেই হলো! **তামাসার শেষ সীমা!** সাধারণ মুসলমানদের কুরান ও বিজ্ঞানের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে এ খেলা তারা খেলে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। যারাই তাদের এ খেলায় বাধ সেধেছে, যুগে যুগে সে মুক্তমনাদের "চরম মূল্য" দিতে হয়েছে। আজও তা অব্যাহত আছে বহাল তবিয়তে!

প্রশ্ন হচ্ছে, এই তামাসাগুলো তারা কেন করেন এবং কীভাবে করেন? এ বিষয়ে আলোকপাত করবো পরবর্তী পর্ব "জ্ঞানতত্ত্বে"।

## আধুনিক বিজ্ঞান

১) **সূর্যের তাপে** প্রতিনিয়ত পৃথিবীর পানি পর্যায়ক্রমে স্থান (আবহাওয়া মণ্ডল, পৃথিবী-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ) ও দশা (তরল-কঠিন-বাষ্প) পরিবর্তন করে। পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। সেখানে ঘনীভূত হয়ে তুষারপাত, মেঘ ও মেঘ থেকে বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টি হয়ে আবার ভূ-পৃষ্টে ফিরে আসে।

২) **পানি চক্রের প্রধান চালিকা** **"শক্তি হচ্ছে 'সূর্য-তাপ (Solar Radiation)", আর "উৎস হলো সমুদ্র"।**

ক) পৃথিবীর মোট পানির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ ঘন মাইল। যার ৩২ কোটি ১০ লক্ষ ঘন মাইলই (৯৭%) সমুদ্রে অবস্থিত। মাত্র ৩% পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে।

খ) **পানি-চক্রে অবস্থিত বাষ্পের ৯০ শতাংশই আসে "সমুদ্র" থেকে।** বাকি ১০ শতাংশ উদ্ভিদ (plants) ও অন্যান্য অবস্থান থেকে।

গ) প্রতি বছর **বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে** (Evapotranspiration) বাষ্পীভূত মোট পানির পরিমাণ ১২১,০০০ ঘন-মাইল। যার ১০৪,০০০ ঘন-মাইলই আসে সমুদ্র থেকে।

ঘ) প্রতি বছর **অধক্ষেপ পদ্ধতিতে** **(precipitation)** বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টি-তুষারপাত-কুয়াশায় আনুমানিক ১২১,০০০ ঘন-মাইল পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। যার ৯৫,০০০ ঘন-মাইলই পতিত হয় সমুদ্রে।

**একটি প্রাসঙ্গিক ভিডিও (৬ মিনিট):**

http://www.youtube.com/watch?v=oaDkph9yQBs

সৌজন্যে: http://cnx.org/content/m40542/latest/
পানিচক্রের তথ্যসূত্র।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১০: জ্ঞান তত্ত্ব

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ পাকের **রেফারেন্স** দিয়ে পাক কালামে ইরশাদ ফরমাইয়েছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো জ্ঞান নাই, যা আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করান নাই। **মুহাম্মদ দাবী করেছেন:**

## ১) আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান কুরানে বিদ্যমান

২৭:৭৫- **আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে।**

## ২) কুরানে আছে সব রকম বিষয়বস্তুর জ্ঞান

১৭:৮৯- আমি এই কোরআনে **মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি।** কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

## ৩) আছে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তের বর্ণনা

ক) ৩০:৫৮-৫৯ - আমি এই কোরআনে **মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি।** আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।

খ) ৩৯:২৭-২৮ - আমি এ কোরআনে **মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি,** যাতে তারা অনুধাবন করে...

পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, **ইসলাম বিশ্বাসীরা কেন কুরানে বিজ্ঞান খোঁজে?** কেন তারা বিজ্ঞানের নামে "তামাসার" আশ্রয় নেয়? কেন তারা কুরানে রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি সহ জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজবে না, যখন তাদের ঐশী কিতাব দাবী করছে: আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান **ইহাতে** বিদ্যমান? কুরানের এই জ্ঞানের "আছরে" ইসলাম বিশ্বাসীরা বুকে বোমা বেঁধে নিজে মরে। অপরকে মারে। হাত-পা কেটে সুস্থ-সবল মানুষকে বিকলাঙ্গ করে। মাটিতে অর্ধেক পুঁতে পাথর মেরে অমানুষিক পৈশাচিকতায় খুন করে সেই একই জ্ঞানের মাতমে! পৃথিবীর মানুষ আজ তটস্থ। এ সত্ত্বেও "জ্ঞানটি" যদি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার হতো (Only for personal use)! কাউকে বাধ্য করতো না তাদের সে জ্ঞানের বলি (victim) হতে। মাইকের আজানের প্রচণ্ড গর্জনে শব্দদূষণ ও অবিশ্বাসীদের সকালের ঘুম হারাম করা থেকে হতো বিরত। অপরের বিশ্বাসের প্রতি দেখাতো সম্মান। অনুন্নত জন্মভূমি থেকে হাজারে হাজারে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে **প্রবাসী হয়ে সে দেশ সহ বিশ্বব্যাপী মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাক্ষী "শরিয়া আইন চালু করার" ব্রতে ব্রতী হয়ে সে দেশের জনগণকে করতো না আতংকগ্রস্ত।** তাহলে এ লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আমরা হতাম আশ্বস্ত। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তা কখনোই হবার নয়। কারণ, ইসলামের জন্মের ইতিহাস হলো ষড়যন্ত্রের ইতিহাস! যে মদিনাবাসী দয়াপরবশ হয়ে মুহাম্মদ ও তার সহচরদের বিপদে "ঠাঁই" দিয়েছিলেন, প্রবাসী হয়ে সে দেশে বংশ-বংশানুক্রমে বসবাসরত মানুষদের বিরুদ্ধে **ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।** ছলে-বলে-কৌশলে হত্যা-খুন- সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করে তাদের "সমস্ত কিছু" গ্রাস করার ইতিহাস। সমস্ত কিছু! শুধু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিই নয়, তাদের ছেলে-মেয়ে-বউ-বাচ্চা কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি। ইসলামের

ভাষায় পরাজিত সেই মানুষগুলো হলো "মাল"; **গণিমতের মাল। সম্পূর্ণ হালাল। ১০০% ইসলাম সম্মত!** ইসলামের "প্রতিষ্ঠাতা" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাতে কলমে তার অনুসারীদের তা শিক্ষা দিয়েছেন! এই যখন অবস্থা, সেখানে কুরান ও বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা তো খুবই সামান্য ব্যাপার! **"কুরান যাবতীয় জ্ঞানের উৎস"- এ দাবী মুহাম্মদের।** মুহাম্মদ অনুসারীরা তাইই করছে, যা মুহাম্মদ তাদেরকে শিখিয়েছেন! ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা বাধ্যতামূলক। **মগজের ব্যবহার "সম্পূর্ণ" নিষিদ্ধ!** Absolutely "NO, NO." মুহাম্মদকে বিশ্বাস করলে এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই! **মুহাম্মদ তার অনুসারীদের "স্বাধীন চিন্তার দরজা" চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন।** আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ঘোষণা:

## অমান্য কারীদের জন্য কঠোর হুমকি ও শাসানী

২৪:৬৩- যারা তাঁর (মুহাম্মদ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, **বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি** তাদেরকে গ্রাস করবে।

৩৩:৩৬- আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে **প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।**

৩৩:৫৭- যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি **ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত** করেন

২৪:৫৪- **আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।** অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী।

**অনুরূপ বাণী: ৪:১৪, ৪:১৫০-১৫১, ৯:২৪, ৯:৬১, ৯:৬৩, ২৪:৬৩, ৪৮:১৩...** এরূপ আরও অনেক।

## মান্যকারীদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

৩৩:৭১- যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, **সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।**

২৪:৫৬- **রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।**

**অনুরূপ বাণী: ৩:৩১, ৩:১৩২, ৪:৬৯, ৪:৮০ ৭:১৫৮, ৪:১৫২, ৫:৫৬, ২৪:৫৬, ৪৮:১০, ৪৯:১৪, ৫৭:৭, ৫৭:১৯, ৫৭:২১, ৫৭:২৮, ৬১:১০-১১** - এরূপ আরও অনেক।

## ইসলাম মূলত: "ক্রীতদাসের"ধর্ম

যেখানে মুহাম্মদ হলো মালিক আর বিশ্বাসীরা হলো দাস। পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসীই 'আবদ-মুহাম্মদ (মুহাম্মাদের দাস)'; দাসের একান্ত (Absolutely mandatory) কর্তব্য হলো মালিককে সে তার কর্ম- ও মনোজগতের "সর্বোচ্চ আসনে" স্থান দেবে। এর অন্যথা দণ্ডণীয় অপরাধ। ইসলাম ১০০% সমগ্রতাবাদী (Totalitarian)। ইসলামী পরিভাষায় যার নাম আল-ওয়ালা-আল বারা (Love and hate for the sake of Muhammad)। ইসলামী "একনায়কত্ববাদের" এই পক্ষাঘাতে তার অনুসারীরা (দাসরা)সম্পূর্ণ পঙ্গু। মুহাম্মদের বিষয়ে বিরূপ 'চিন্তা বা ধারনা' করার ক্ষমতা বিশ্বাসী মগজে অসম্ভব। তাই বিশ্বাসী তফসিরকারীরা সম্পূর্ণ

অসহায়। **এই অসহায়ত্ব থেকে "মুহাম্মাদ"যে অভ্রান্ত, এটা প্রমাণ করতে তফসিরকারীদের যুক্তির কোনো অভাব হয় না।** সে যুক্তিগুলো যতই "উদ্ভট" হোক না কেন, বিশ্বাসীরা বাধ্য তাকেই অকাট্য জ্ঞান করতে! বর্তমানের "জ্ঞান ও বাস্তবতার" সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে তাদের সামনে মাত্র **"দুটি" পথ খোলা।** তা হলো:

## ১) বিশ্বাসে অটল থাকা- অত্যন্ত সহজ, নির্ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকি-হীন

মুহাম্মদ সত্য নবী। কুরান সৃষ্টিকর্তার বাণী। এ বিশ্বাসে অটল থেকে আধুনিক জ্ঞান ও বাস্তবতাকে **"বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা**"সহ যাবতীয় কসরতের সাহায্যে কুরানের বাণীর সাথে মেলানোর চেষ্টা করা। মুক্তবুদ্ধির মানুষের কাছে এ কসরত/কার্যকলাপ যতই উদ্ভট ও হাস্যকর হোক না কেন! মুহাম্মদ ৭ম শতাব্দীর এক নিরক্ষর আরব বেদুইন। উদ্দেশ্যমূলক বা মতি-বিভ্রমের (Delusion) বশবর্তী হয়ে তিনি বলতেই পারেন, **"আল্লাহ (সৃষ্টিকর্তা) ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। আল্লাহ 'কসম কাটেন। মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। আরশ থেকে ফেরেশতা পাঠায়ে তার 'অস্বীকারকারীকে'খুন করেন।"** তার প্রত্যক্ষ অনুসারীরা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতে পারে। এতে আশ্চর্য হবার তেমন কোনো কারণ নেই। কারণ তারাও 'সে যুগেরই' বাসিন্দা। একইভাবে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কোনো সাধারণ মানুষ, যারা এই 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের' বিশালতার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই রাখেন না, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু যখন কোন "পণ্ডিত/তফসির-কার/ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ' ইন্টারনেটসহ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে "অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট বিশ্বাস"-এর সপক্ষে কু-যুক্তি ও মিথ্যাচার করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করে, তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না! প্রমাণ হয়, **বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অবশ করে দেয়।**

## ২) দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে “সত্যকে”আলিঙ্গন

মুহাম্মদের যাবতীয় প্রলোভন ও ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে **“সত্যকে”**আলিঙ্গন করার সৎ সাহস অর্জন। এ পথের প্রাথমিক (Initial) স্তরটি অত্যন্ত দুরূহ ও বেদনাদায়ক! বিশেষ করে যারা আমার মত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। “Freedom is not Free!” এই প্রাথমিক স্তরটিকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করার পরের প্রাপ্তি- **"মুক্তির”**অনাবিল আনন্দ! দাসত্বের মেকী আনন্দের সাথে স্বাধীনতার সত্যিকারের আনন্দের তুলনা অর্থহীন!

## দুটি বিশেষ সতর্ক সংকেত!!

যে কোন অজানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও সিদ্ধান্ত নিতে হলে চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন করা অবশ্য অত্যাবশ্যক। তা না হলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। ইসলামী যে কোন আলোচনায় **বিভ্রান্ত হতে না চাইলে দুটি বিশেষ "সতর্ক সংকেত" সর্বদা সর্বান্তকরণে মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী:**

## ১) "বিভ্রান্তি হইতে সাবধান!”

## কুরানের বক্তা মুহাম্মদ, সৃষ্টিকর্তা নয়!

ইসলামের যে কোনো বিষয়ে আন্তরিক আলোচনা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পক্ষের বক্তা যে-মিথ্যা বাক্যটি দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন তা হলো, **"আল্লাহ পাক কুরানে ইরশাদ ফরমাইয়েছেন-।"** নি:সন্দেহে বক্তা মশায় এ বাক্যটির মাধ্যমে "আল্লাহ ওরফে মুহাম্মদ (একই ব্যক্তি)" বুঝাতে চান না? তিনি "আল্লাহ" অর্থে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্তাকে

বুঝাতে চান! **সত্য হচ্ছে, "বক্তা এখানে মুহাম্মদ(আল্লাহ), সৃষ্টিকর্তা নয়!" সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই কুরানে ইরশাদ করেন নাই।** ইরশাদ ফরমাইয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। **মুহাম্মদের দাবী, তাঁর বাণীগুলো 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার"; মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে তার "আল্লাহর" কোন অস্তিত্ব নাই।** মুহাম্মদের বর্ণিত আল্লাহ যে ভুলে ভরা "এক মনুষ্য" প্রতিকৃতির বাস্তব রূপ, সে আলোচনা গত নয়টি পর্বে করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতেও তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং মুহাম্মদের বর্ণিত আল্লাহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভাবার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। আলোচনা শুরুর আগেই পক্ষের বক্তা মশায় বিসমিল্লাতেই **"মিথ্যা বাক্যটি"** দিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন তা যে কোনো সুস্থ চিন্তাশীল মানুষই বুঝতে পারেন।

এই চমকপ্রদ (Magnificent) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আদৌ আছে কি নেই, সে প্রশ্ন এ বিতর্কে অপ্রাসঙ্গিক। সেই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন কি করেন না, সেটাও এ বিতর্কের বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে প্রশ্ন ও তার কার্যকলাপের সমালোচনা করতে পারি কি না, সে প্রশ্ন এখানে বাতুলতা। আমাদের প্রাত্যহিক অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার বিপরীতে "স্রষ্টা" নামক প্রতিরক্ষা বর্মটি (Defensive) আমাদের উর্বর-মস্তিষ্কেরই (Superior Intelligence) "সৃষ্টি" কি না, তাও এ আলোচনার বিষয় নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উচিত নাকি অনুচিত, প্রয়োজন নাকি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক নাকি লাভজনক, সে বিষয়ের অবতারণা এ আলোচনায় অর্থহীন। **এ আলোচনার "একমাত্র বিষয়" স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বক্তব্য ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার দাবীর যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণ!** তাঁর কার্যকলাপ কি "ঐশ্বরিক (Divine)" নাকি "দানবীয় (Demonic)"? তারই নির্ধারণ। মুহাম্মদের দাবীকৃত "আল্লাহ" কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকেন) গুনে গুণান্বিত হবার যোগ্যতা রাখেন? এ আলোচনার উদ্দেশ্য তারই নির্ধারণ। **বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যে "সত্যে" আমরা একমত, তা হলো- সৃষ্টিকর্তার বাণীতে**

**কোনোরূপ অসামঞ্জস্য-ভুল-মিথ্যা থাকতে পারে না।** ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, মুহাম্মদের প্রচারিত বাণী আধুনিক জ্ঞানের আলোকে বিকার-গ্রন্থ মানুষের **প্রলাপের** সামিল। সুতরাং, আলোচনা শুরু হওয়ার মুহূর্তেই মুহাম্মদের বাণীকে "সৃষ্টিকর্তার বাণী" বলে চালানোর চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক, অসৎ ও মিথ্যাচার।

## ২) "প্রতারণা হইতে সাবধান"!

ইসলামী পণ্ডিতরা যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানদের আবেগ, ধর্ম-বিশ্বাস এবং কুরান ও বিজ্ঞানের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে মিথ্যাচার করে আসছেন। **কীভাবে?** কিছু উদাহরণ:

### ক) "বিজ্ঞান বিজ্ঞ"আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বক্তা ও শ্রোতা

**এ সব পণ্ডিতরা আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত।** ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টরেট, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, প্রভাষক, প্রফেসার, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক - এ জাতীয় ব্যক্তিত্ব। এ সব পণ্ডিতরা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে সচরাচর যে প্রতারণার আশ্রয় নেন তা হলো বিজ্ঞানের মোটামুটি "সঠিক তথ্যের" সাথে **"কুরানের অপব্যাখ্যা"**জুড়ে দেন। অপব্যাখ্যার সাথে যোগ হয় মিথ্যাচার। প্রায় সময়ই কুরানে যার আদৌ কোনো উল্লেখই নেই তাও প্রয়োজনমত যোগ করেন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে। সব ক্ষেত্রেই যে তিনি তা জ্ঞাতসারে করেন তা নয়। তাদের অধিকাংশেরই "ইসলামী জ্ঞান" মসজিদ-তাবলীগ-ওয়াজ মাহফিলে মৌলোভী সাহেবের বয়ান, টিভি আলোচনা অনুষ্ঠান অথবা ডাঃ জাকির নায়েকের মিথ্যাচার থেকে অর্জিত। Critical দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে "বুঝে" সম্পূর্ণ কুরান জীবনে একবারও জানার চেষ্টা ও হয়তো করেন নাই। সেই জ্ঞানের আলোকে তারা যখন বক্তৃতা করেন, আর্টিকেল লিখেন, 'ব্লগে' বিতর্কে নামেন তখন তারা এই পদ্ধতিটি

ব্যবহার করেন। আলোচনার সময় প্রায়ই দ্রুত গতিতে এ শ্রেনীর বক্তা গরগর করে কম করে "হাফ-ডজন লিস্ট" উল্লেখ করেন। **কিসের?** নামের। কিছু উদাহরণ,

১) বিখ্যাত/অখ্যাত **"ব্যক্তিবর্গের নাম ও তাদের উদ্ধৃতি"!** সেই উদ্ধৃতির সাহায্যে আলবার্ট আইনস্টাইন কিংবা স্টিফেন হকিংদের "আস্তিক" বানিয়ে ছাড়েন!

২) বিখ্যাত/অখ্যাত **"বইয়ের নাম ও উদ্ধৃতি"**। সে বইগুলো পুরোটা বুঝে তারা জীবনে কখনো পড়েছেন এমন প্রমাণ পাবেন না। অল্প কিছুদিন আগে মুক্তমনায় এক বিতর্কে "Grand Design" বইটির উদ্ধৃতি দিয়ে এক লেখক/বক্তা আমাকে প্রফেসার স্টিফেন হকিং এর "আস্তিকতার" প্রমাণ হাজির করলেন!

৩) **"সুরা ও আয়াতের নাম"**। উদ্ধৃত সে আয়াতগুলো যদি পরখ না করতে যান, তবে **"আসল চমক"** থেকে বঞ্চিত হবেন। অধিকাংশ সময়েই বক্তার দাবী আর কুরানের বক্তব্যের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাবেন না!

কুরান-অজ্ঞ শ্রোতামণ্ডলী 'অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচারক' ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হন এই ভেবে যে, কুরান সৃষ্টিকর্তার বাণী না হলে এই 'সঠিক তথ্যটি' মুহাম্মদ কীভাবে জেনেছেন? সমাজের অল্প-শিক্ষিত বিশ্বাসী মানুষ এরূপ বক্তা ও উচ্চশিক্ষিত বিশ্বাসী শ্রোতা মণ্ডলীদেরকে “উদাহরণ" হিসাবে বিবেচনা করে কুরানের যথার্থতার বিষয়ে হন নিঃসন্দেহ!

### খ) “বিজ্ঞান অজ্ঞ” বক্তা ও শ্রোতা

এ শ্রেণীর বক্তা অধিকাংশই মোল্লা-মৌলভী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তারা আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো ধারনাই রাখেন না। তারা **“বিজ্ঞানের অপব্যখ্যা**”করে কুরানের সাথে

জুড়ে দেন। ওয়াজ-মাহফিলে তারা তাদের অজ্ঞাতেই এসব **"অপবিজ্ঞান" প্রচার** করে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেন। বিজ্ঞান-অজ্ঞ ব্যক্তিরা, কুরানে সঠিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও 'বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যাটি' ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হন।

## গ) কুরান ও বিজ্ঞান দুটোতেই অজ্ঞ বক্তা ও শ্রোতা

বলা বাহুল্য, সিংহভাগ বক্তা ও শ্রোতা এই দলের। যে কোনো মানের ইসলামী পণ্ডিত বক্তা ইচ্ছেমত **"যেমন খুশি তেমন' করে কুরান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা /অপ ব্যাখ্যা করে শ্রোতা মণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করেন।** ধরা পড়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই! শ্রোতামণ্ডলী 'সোবহানাল্লাহ, সোবহানাল্লাহ' জপতে জপতে আসর গরম করেন।

## ঘ) Any combination of above three

ওপরে উল্লেখিত যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, ইসলামী পণ্ডিতদের আলোচনা/নিবন্ধের **"শেষের বাক্য গুলো প্রায় সব ক্ষেত্রে একই"**। তা হলো,

"১৪০০ বছর আগে নবী করিম (সাঃ) জিবরাইল মারফত যে ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার সাথে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের **"হুবহু মিল"**! কুরানের এই **"নিখুঁত বর্ণনাই"** প্রমাণ করে নবী করিম (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রসুল। কুরান আল্লাহর কালাম না হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের এ তথ্যগুলো জেনেছিলেন! --' সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ!"

জ্ঞানই সকল পরিবর্তনের উৎস (Knowledge changes everything))। আজকের এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে যে কোনো মুক্তচিন্তার মানুষ, বিশেষ করে যারা ইন্টারনেটের

সুবিধাপ্রাপ্ত, সঠিক তথ্য অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারেন। **কুরানে "কী লিখা আছে" তা কুরানের যে কোনো অনুবাদ থেকে এবং "আধুনিক বিজ্ঞান" কী বলছে তা যে কোনো বিজ্ঞান বই ও প্রবন্ধ থেকে নিমিষেই যাচাই করে নিতে পারেন।** ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তির বক্তৃতায় বিভ্রান্ত হতে না চাইলে এর কোন বিকল্প নেই।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১১: অভিশাপ তত্ত্ব
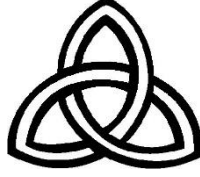
**করুণাময় আল্লাহ!**

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) দাবী করেছেন যে, আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে **অভিশাপ** দেন। কিছু উদাহরণ:

**স্বয়ং আল্লাহর অভিসম্পাত**

২:৮৮- তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত| এবং তাদের কুফরের কারণে **আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন|** ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে|

৪:৪৬- কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি| তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত| মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)| অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত, ) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম্ আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক| কিন্তু **আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন** তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক|

৪:৪৭- হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে| (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অত:পর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা **অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে-সাবতের উপর|** আর আল্লাহ্ নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে|

৪:৫১-৫২- তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে| এরা হলো সে সমস্ত লোক, **যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং|** বস্তুত: আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না|

৫:১৩- অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন **আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি** এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি|

৫:৬০- বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্ কাছে? **যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন,** যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে|

৫:৬৪- আর ইহুদীরা বলে: আল্লাহ্ হাত বন্ধ হয়ে গেছে| তাদেরই হাত বন্ধ হোক| একথা বলার জন্যে **তাদের প্রতি অভিসম্পাত**| বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত| তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন| আপনার প্রতি পলনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে| -

৩৩:৬৪- নিশ্চয় **আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত** করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।

১১:১৮- আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মূখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর **আল্লাহর অভিসম্পাত** রয়েছে।

২৮:৪১-৪২- আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। **আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের (ফেরাউন ও তার বাহিনী) পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি** এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত।

প্রতীয়মান হয় যে, প্রবক্তা মুহাম্মদ "স্বয়ং আল্লাহর" অভিশাপকে যথেষ্ট মনে করেন নাই!
ফেরেশতাবৃন্দ ও সমগ্র মানুষকুলকেও আল্লাহর অভিশাপের সাথে সামিল করেছেন। যেমন:

## আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত

২:১৬১- নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি **আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত**
৩:৮৭- এমন লোকের শাস্তি হলো **আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।**

এখানেই শেষ নয়! আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবী হুযুরে পাক (সা:) ঘোষণা দিয়েছেন যে, **সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কার্যকারী পন্থা হলো 'অভিশাপ আসর'**| তিনি দাবী করেছেন যে, আল্লাহ সকল বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এবং তাদের পরিবারবর্গকে অভিশাপের আসর বসানোর আহ্বান জানান। যেন সে আসরে অংশগ্রহণকারী সদস্য-সদস্যারা একে অপরকে অভিশাপে জর্জরিত করে **সঠিক সত্য** উদঘাটন করতে পারে! মুহাম্মদের ভাষায়:

## সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মিলে অভিশাপের আসর

৩:৬১- অত:পর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল-এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা **সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী |**

## মুহাম্মদের দাবীর সারসংক্ষেপ:

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ স্বয়ং** মানুষকে অভিশাপ দেন। তিনি তার **ফেরেশতা বাহিনী ও সমগ্র মানুষকুলকে** ও সেই অভিশাপে সামিল করেন। মহা জ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে শিখিয়েছেন **সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কার্যকারী পন্থা হলো "অভিশাপ আসর"।** যেন তারা সে আসরে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অভিশাপে জর্জরিত করে কোন পক্ষ সত্যবাদী আর কোন পক্ষ মিথ্যেবাদী তা বের করতে পারে। আসল **সত্যের সন্ধান** লাভ করতে পারে। আল্লাহ পাক সমগ্র মানুষ জাতিকে (বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী সবাই মিলে প্রার্থনা-কুরানের বিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের মানুষের জন্য প্রযোজ্য) সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের এই প্রতিযোগিতামূলক **অভিশাপ আসরে** অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন!"

Wow! পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, মুহাম্মদ (আল্লাহ) শুধু কসমেই 'চ্যাম্পিয়ন' নন (অষ্টম পর্ব), অভিশাপেও তিনি 'চ্যাম্পিয়ন'। জগতের কোনো মানুষ কি কল্পনা করতে পারেন যে, **একে অপরকে "অভিশাপ প্রদান"-এর মাধ্যমে আসল সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় (৩:৬১)?** **মুহাম্মদের কথিত আল্লাহ যে মহাজ্ঞানী, এতে কি এখনও সন্দেহ পোষণ করছেন? আর এই মহাজ্ঞানী সত্ত্বাই যে সৃষ্টিকর্তা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলে জানবেন, "এই সেই কিতাব যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই (২:২)"|** এর পরেও যদি ঈমানে দুর্বলতার কারণে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে সন্দেহকারীদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কী পরিমাণ **ভয়াবহ শাস্তি** যে অপেক্ষা করছে, তা বারংবার স্মরণ করুন! মুহাম্মদ (আল্লাহ) "অত্যন্ত স্পষ্ট" ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন কুরানের অসংখ্য বাণীতে। তত্ত্ব কথার মত অস্পষ্টতার ছিটে ফোটাও সে বাণীগুলোতে খুঁজে পাবেন না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানবেন "হুমকি-শাসানী-ভীতি' পর্বে। সমগ্র কুরানে মোটামুটি ৬২৩৬ টি বাণী আছে। এর ৫০০ টিরও বেশী **শুধু-মাত্র** হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ সম্পর্কিত! মহানবী মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে এসকল বাণী বর্ষণ করেছেন সুদীর্ঘ ২৩ বছর (৬১০-৬৩২)! **তার ইন্তেকালের পর মুমিন বান্দারা দিনে কমপক্ষে বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সুললিত কণ্ঠে এসকল অভিশাপ-হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপের বাণী তেলাওয়াত করে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকেন!** যতদিন "ইসলাম" বেঁচে থাকবে, মুহাম্মদের আদর্শের লোকেরা বুঝে বা না বুঝে (আরবি না জানার কারণে) পরম একাগ্রতা ও পবিত্র জ্ঞানে পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদেরকে অভিসম্পাত ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই যাবেন! এ থেকে তাদের কোনই পরিত্রাণ নেই! "কেন নেই" তার আলোচনা দশম পর্বে করা হয়েছে!

**দুটি অতি সাধারণ প্রশ্ন:**

**১. "অভিশাপ" বিষয়টি আসলে কী?**

সহজ উত্তর: **"মনে-প্রাণে অপরের অনিষ্ট কামনা (প্রার্থনা ) করা"**| আল্লাহর শক্তিমত্তার ধারা বিবরণীতে অন্যত্র মুহাম্মদ দাবী করেছেন, 'তিনি (আল্লাহ) যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও'তখনই তা হয়ে যায় **(৩৬:৮২)|**' কুরানের এই বাণীটি বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত, "কুন ফা ইয়া কুন"। ৩৬:৮২ সত্য হলে সৃষ্টিকর্তা কোনোভাবেই 'অভিশাপকারী' হতে পারেন না। কারণ, ইচ্ছা (Wish) করার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ঘটনাটি ঘটে যায়, তখন তা হয় **'কর্ম' (Physical Act)|** "ইচ্ছাশক্তি" সেখানে হাত-পা-মুখ-জিহ্বা ইত্যাদি শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনের বাহন হিসাবে কাজ করে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইচ্ছা" করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইচ্ছাটি 'কর্মে' পরিণত হবার কারণে **"অনিষ্ট (অভিশাপ) কামনা নিয়ে অপেক্ষা"**অসম্ভব, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়! কারণ 'ইচ্ছা = কর্ম'।

তাহলে? **প্রয়োজনটি কার?** নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের। মুহাম্মদ কি "কুন ফা ইয়া কুন (৩৬:৮২)" ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? অবশ্যই না। প্রয়োজন আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই এমন ব্যক্তি কি রুষ্ট হয়ে তার প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনা (অভিশাপ) করতে পারেন? অবশ্যই হ্যাঁ। সুতরাং **নিঃসন্দেহে কুরানের যাবতীয় "বিষোদগার" মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর। সৃষ্টিকর্তার সাথে এর কোনোই সংস্রব নেই।**

## ২. মানুষ কি কারণে অভিশাপ দেয়?

### ক) ব্যর্থ হলে

প্রতিপক্ষের কথায় ও কাজে কোনো রুষ্ট ব্যক্তি যখন বিষয়টির প্রতিকার করতে **"ব্যর্থ হন"** তখনই সে ব্যক্তি 'অভিশাপের আশ্রয়' নেন। প্রতিকারের ক্ষমতা থাকলে বিষয়টির নিষ্পত্তি তিনি করবেন তার সেই ক্ষমতাবলে। **বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই "অক্ষম নন"! তাই তার "অভিশাপের আশ্রয়" নেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই।**

**খ) লাভ-ক্ষতির প্রয়োজনে**

**নিজের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ না হলে কোনো সাধারণ মানুষও অন্যের "অনিষ্ট কামনা" করে না।" একমাত্র নিম্ন-প্রকৃতির লোকেরাই নিজের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ ছাড়াই অপরের অনিষ্ট কামনা করে।** সৃষ্টিকর্তার ক্ষতি-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কি মানুষের আছে? অবশ্যই "না"। তাহলে? সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষকে অভিশাপ দেবেন? একজন সাধারণ মানুষও যা করেন না, সেই কাজটি "সৃষ্টিকর্তা" করেন, তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? কোনো সুস্থচিন্তার মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে কখনোই "নিম্ন-প্রকৃতির লোকের চরিত্রে" কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে অসংখ্যবার অভিশাপ দিয়েছেন, তার সাক্ষ্য হয়ে আছে উপরের বাণীগুলো!

## মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন?

সুতরাং কসম-তত্ত্বের মত আবারও যে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন? বিশ্বের প্রতিটি ইসলামবিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদের চরিত্রে কোনো কালিমা নেই। দাবী করেন, মুহাম্মদ ছিলেন **নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, মহানুভব**--ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় গুনের অধিকারী। তাদের এ সকল দাবীর পেছনে সত্যতা কোথায়?

কুরানের যাবতীয় অভিশাপ মুহাম্মদের। সৃষ্টিকর্তার সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ব্যক্তি কি অন্যের অনিষ্ট কামনা করেন? নিজের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ না হলে কোনো সাধারণ মানুষও যেখানে অন্যের অনিষ্ট কামনা করেন না, সেখানে মুহাম্মদ কী কারণে অসংখ্যবার তার প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনা করেছিলেন? **নিজের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে ব্যক্তিটি যে একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও "নিম্ন-প্রকৃতির", এ সত্যকে কি অস্বীকার করা যায়?**

যারা আঘাতকারীকে ক্ষমা করেন, তাঁরা সৎ লোক। যারা আঘাতকারীর সুফল কামনা করেন, তারা মহামানব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরাই ছিলেন আগ্রাসী (অষ্টম পর্ব)। আক্রান্ত জনগোষ্ঠী করেছেন তাদের জান-মাল হেফাজতের চেষ্টা। আঘাতকারী ছিলেন মুহাম্মদ! অভিশাপকারীও তিনিই! হুমকি, অসম্মান, ভীতি প্রদর্শন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারীও সেই একই ব্যক্তি! **মুহাম্মদের নিজের জবানবন্দীই (কুরান) এ সাক্ষ্য ধারণ করে আছে।** যুগে যুগে যাঁরাই এ সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরকেই প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় দমন করা হয়েছে। যে শিক্ষার **প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল** মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! বিশ্বাসীরা তার "অনুসারী" মাত্র। আজ ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে যে কোন সত্য উন্মোচনের পথ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নিরাপদ। ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মুহাম্মদকে সঠিকভাবে জানতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই! তাকে জানার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম তিনি নিজেই রচনা করে রেখেছেন। আসুন, আমরা নির্মোহ মানসিকতা নিয়ে "মুহাম্মদের জবানবন্দী" পাঠের মাধ্যমে তাকে ও ইসলামকে জানার চেষ্টা করি।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১২: আবু-লাহাব তত্ত্ব
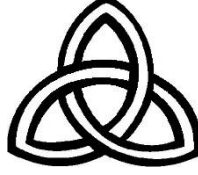
## বিসমিল্লাহতেই "অভিশাপ"!

এই সেই বিখ্যাত **সুরা লাহাব!** সুরা নম্বর ১১১, আয়াত সংখ্যা পাঁচ।

১১১: ১-৩- **আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,** কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

১১১: ৪-৫- **এবং তার স্ত্রীও**-যে ইন্ধন বহন করে, **তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।**

এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত সুরা! দৈনন্দিন নামাজে সাধারণ মুসলমানেরা সুরা ফাতিহার পরেই যে সুরাগুলো সচরাচর পাঠ করেন, এই সুরাটি তাদেরই একটি। একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, এই সুরার পাঁচটি বাক্যের কোথাও **বক্তার** উল্লেখ নেই। কুরানের বহু বহু আয়াতের মত "বলুন" শব্দটি দিয়েও এর শুরু নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীকে এই বাক্যগুলো দিয়েই **অভিশাপ বর্ষণ** করছেন! সবচেয়ে প্রাচীন বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের (ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, ইমাম বুখারী) বর্ণনা মতে এই ঐতিহাসিক

ঘটনাটি ঘটেছে সেই সময়ে, যখন মুহাম্মদ **সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে** তার বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি)।

## কে এই আবু লাহাব?

আবু লাহাবের আসল নাম আবেদ-উজ্জাহ। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতা আবেদ-আল্লাহর (আবদুল্লাহ) নিজের ভাই। **মুহাম্মদের দাদা** ছিলেন আবেদ-আল মুত্তালেব। আবেদ-আল মুত্তালেব নামটি তার পরিবার প্রাপ্ত কিংবা বংশানুপ্রাপ্ত নাম নয়। এটি একটি উপাধি। আবেদ-আল মুত্তালেব এর আসল নাম ছিল **সেইবাহ ইবনে হাশিম।** সেইবাহ (Shaybah) শব্দের অর্থ - সাদা চুল। আবেদ আল-মুত্তালিব ('সেইবাহ) এর পিতার (হাশিম) চার ভাই: আবেদ-সামস, নওফল, হাশিম ও আল-মুত্তালিব। তাদের বাবার নাম ছিল আবেদ-মানাফ (মুহাম্মদের দাদার দাদা); হাশিম ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রায়ই মদিনার ওপর দিয়ে সিরিয়া যেতেন। **মদিনায় তিনি সালমা বিনতে আমর নামের এক মহিলাকে (খাজরাজ বংশ) বিয়ে করেন। সালমার গর্ভে হাশিমের ঔরসজাত পুত্রটিই হলেন সেইবাহ।** সেইবাহ তার মায়ের সাথে মদিনাতেই থাকতেন। সেইবাহর শিশুকালে পিতা হাশিমের মৃত্যু হয়। হাশিমের ভাই আল-মুত্তালিবও ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যেতেন অহরহ। একবার সিরিযা থেকে ফেরার পথে আল-মুত্তালিব সেইবাহকে উঠের পিঠে করে মক্কায় তার নিজের পরিবারে (সেইবাহর পিতৃ-পরিবার) নিয়ে আসেন। মক্কার অধিবাসীরা সেইবাহকে চিনত না। তারা আল-মুত্তালিবের সাথে তারই উঠের পিছনে উপবিষ্ট সেইবাহকে দেখে বলাবলি শুরু করলো, 'এ যে দেখি আল-মুত্তালিবের দাস (আবেদ-আল মুত্তালিব)! সে তাকে কিনে নিয়ে এসেছে।" আল-মুত্তালিব বললেন, "বাজে কথা! এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। একে আমি মদিনা থেকে নিয়ে এসেছি।" সেই থেকে লোকে সেইবাহ কে 'আবেদ-আল মুত্তালিব' নামেই সম্বোধন করতো **(১).** আবদ-

আল মুত্তালিব (আবদুল মুত্তালিব)-এর বৃহৎ সংসার। তার ছিল পাঁচ স্ত্রী, দশ ছেলে ও সাত কন্যা (২). ছেলেরা হলেন,

১) স্ত্রী ফাতিমার গর্ভে: আবেদ-আল্লাহ (মুহাম্মদের পিতা), আবু-তালিব (আসল নাম আবেদ-মানাফ) এবং আল-যুবায়ের
২) স্ত্রী হালার গর্ভে: হামজা (মুহাম্মদের প্রায় সমবয়স্ক), হাজল ও আল-মুকায়িম
৩) স্ত্রী নাতায়েলার গর্ভে: আল-আব্বাস ও দিরার
৪) স্ত্রী লুবনার গর্ভে: আবু-লাহাব
৫) স্ত্রী সামরার গর্ভে: আল-হারিথ

কন্যারা হলেন: সাফিয়া, উম্মে হাকিম, আল-বেইদা, আতিকা, উমাইয়ামা, আরওয়া এবং বারাহ। মুহাম্মদের আট বছর বয়সে ইয়ামেনে আবদ-আল মুত্তালেবের মৃত্যু ঘটে।

## কী অপরাধ ছিল আবু লাহাবের?

তার একমাত্র অপরাধ - তিনি তাঁর নিজের ধর্মকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন মুহাম্মদ কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য এবং পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেছিলেন, তখনই কেবল কুরাইশরা তাদের ধর্ম-রক্ষা ও পূর্ব-পুরুষদের অবমাননার প্রতিবাদেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তার আগে কুরাইশরা কখনোই মুহাম্মদের প্রচারণায় বাধা দেন নেই (৩)।

"When the apostle openly displayed Islam as God ordered him his people did not withdraw or turn against him, so far I (Ibne Humayd) have heard, until he spoke disparagingly of their gods. When he did

that they took great offence and resolve unanimously to treat him as an enemy.------”.

মুহাম্মদের এহেন **আগ্রাসী প্রচারণার** বিরুদ্ধে আবু লাহাব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি নির্বোধ ছিলেন না। ছিলেন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর (হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে) এই আবু লাহাবই হয়েছিলেন মুহাম্মদের বংশ (হাশেমী) প্রধান। সেই অপরাধে কি আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালফ, আবু জেহেল সহ অন্যান্য কুরাইশদের অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়? **যদি এর জবাব হয় "না",** তবে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় বিষোদগার, শাপ-অভিশাপ, তাচ্ছিল্য, শত্রুতা কোনো মহানুভব-বিবেকবান-সৎ মানুষের পরিচয় নয়। সত্য যে তার ঠিক বিপরীত, তা বোঝা যায় অতি সহজেই! **যদি এ প্রশ্নের উত্তর হয় "হ্যাঁ,** তাহলে সে অপরাধের জন্য মুহাম্মদ ও তার সহকারীরা আরও **অনেক অনেক বেশি দায়ী।** ক্ষমতা হাতে আসার পরে কুরাইশদের তুলনায় মুহাম্মদ ও তার সহকারীরা আরও অনেক অনেক বেশি উগ্রতা দেখিয়েছিলেন। **তার জের চলছে আজও!** যে ক্বাবা শরীফে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ৩৬০ টি মূর্তি ছিল, যার সামনে বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ দেব-দেবীদের প্রার্থনা পাশাপাশি বসে করতেন, সেই মক্কা শরীফে আজ অমুসলিমদের প্রবেশ পর্যন্ত নিষেধ! মক্কা শরিফ তো অনেক দূরের কথা, যে কোনো মসজিদ বা মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলাম, কুরান অথবা মুহাম্মদের সমালোচনাকারীর কী পরিণাম হতে পারে তা আমরা সবাই জানি। সমালোচনাকারী যে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না, তা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। টেরি জোন্স কুরান পোড়ালো আমেরিকায়, আর আফগানিস্তানে তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের হাতে খুন হলো নিরীহ ২০ জন মানুষ (ইউ এন কর্মী)।

এটা মুহাম্মদের শিক্ষা। তাঁর জীবনী পড়লেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন। **কুরাইশরা মুহাম্মদ এবং তার সাহাবিদেরকে ঠিক কী অত্যাচার করতেন, তার সুনির্দিষ্ট (Specific)**

**উল্লেখ কুরানের কোথাও নাই।** কুরাইশরা কোনো মুসলমানকে খুন করেছেন, মরুভূমির মধ্যে বালিতে শুইয়ে রেখে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন (বেলালের গল্প), কিংবা কোনো শারীরিক আঘাত করেছেন - সমগ্র কুরানে এমন এ**কটি উদাহরণও নেই।** Not a single one! কিন্তু মুহাম্মদ (আল্লাহ) কুরাইশ ও অমুসলিমদের কীভাবে অভিশাপ দিয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন, তাদেরকে বাড়ি ঘর থেকে উৎখাত করেছেন, তাদের জান-মাল লুট করে ভাগাভাগি করেছেন (১/৫ মুহাম্মদ এবং ৪/৫ অন্যান্যরা) তার বিষদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী পর্বগুলোতে পাঠকরা তা পর্যায়ক্রমে জনাতে পারবেন।

ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন মুহাম্মদ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। যখন তাঁর কোনো বাহুবলই ছিল না। সে সময়েও মুহাম্মদ তার প্রতিপক্ষকে "অভিশাপ" দিতে দ্বিধান্বিত হননি। এমনকি তাঁর নিকটাত্মীয়ও বাদ পড়েননি। শুধু কি অভিশাপ! হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান, দোষারোপ কোনোকিছুই তিনি বাদ রাখেননি। সে সময় তাঁর শক্তি ছিল না প্রতিবাদকারী ঐ সব কাফেরদেরকে শারীরিক বা বৈষয়িকভাবে **শায়েস্তা করার!** থাকলে তিনি তাদের যে কি হাল করতেন, তার নমুনা ইতিহাস হয়ে আছে শক্তিমান মুহাম্মদের মদিনার বাণী ও কর্মকাণ্ডে! **অল্প কিছু উদাহরণ (৪),**

**১. প্রতারণার (Taqya) মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে পেশাদার খুনি/সন্ত্রাসী কায়দায় ক্বাব বিন আশরাফ-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড,**

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৬৯

(অংশ বিশেষ) "Narrated Jabir bin 'Abdullah: Allah's Apostle said, **"Who is willing to kill Ka'b bin Al-Ashraf** who has hurt Allah and

His Apostle?" Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, "O Allah's Apostle! Would you like that I kill him?" The Prophet said, "Yes," Muhammad bin Maslama said, **"Then allow me to say a (false) thing (i.e. to deceive Kab).** "The Prophet said, **"You may say it.**

... Muhammad bin Maslama requested Ka'b **"Will you allow me to smell your head?"** Ka'b said, "Yes." Muhammad smelt it and made his companions smell it as well. Then he requested Ka'b again, "Will you let me (smell your head)?" Ka'b said, "Yes." When Muhammad got a strong hold of him, he said (to his companions), "Get at him!" So they killed him and went to the Prophet and informed him. (Abu Rafi) was killed after Ka'b bin Al-Ashraf."

## ২. রাতের অন্ধকারে পেশাদার খুনি/সন্ত্রাসী কায়দায় আবু আফাককে নৃশংস ভাবে খুন,

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১

(অংশ বিশেষ) "Narrated Al-Bara bin Azib: **Allah's Apostle sent some men from the Ansar to ((kill) Abu Rafi,** the Jew, and appointed 'Abdullah bin Atik as their leader. Abu Rafi used to hurt Allah's Apostle and help his enemies against him. ------ ' **So I reached him and found him sleeping in a dark house amidst his family,** I could not recognize his location in the house. So I shouted, 'O Abu Rafi!' Abu Rafi said, 'Who is it?' I proceeded towards the source of the voice and **hit him with the sword**, and because of my perplexity, I

could not kill him. He cried loudly, and I came out of the house and waited for a while, and then went to him again --- **I again hit him severely** but I did not kill him. **Then I drove the point of the sword** into his belly (and pressed it through) till it touched his back, and I realized that I have killed him. ----- Thereupon --- I (along with my companions proceeded and) **went to the Prophet and described the whole story to him..."**

## ৩. পাঁচ সন্তানের মা আসমা-বিনতে মারিয়া কে খুন,

**কী তাঁর অপরাধ?** মুহাম্মদের নৃশংস কাজের প্রতিবাদ করে তিনি **"কবিতা"** লিখেছিলেন! হ্যাঁ, কবিতা!

(ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬)

(অংশ বিশেষ) "---When the apostle heard what she had said he said, **"Who will rid me of Marwan's daughter?"** `Umayr b. `Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and **that very night he went to her house and killed her.** In the morning he came to the apostle and told him what he had done and he [Muhammad] said, "You have helped God and His apostle, O `Umayr!" **When he asked if he would have to bear any evil consequences** **the apostle said, "Two goats won't butt their heads about her",** so `Umayr went back to his people."

## ৪. বানু কুরাইজার গণহত্যাযজ্ঞ,

ক) ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯

(অংশ বিশেষ) “-----The apostle of Allah imprisoned the Qurayza in Medina while **trenches were dug in the market place.** Then he sent for the men and had **their heads struck off so that they fell in the trenches**. They were brought out in groups, and among them was Kab, the chief of the tribe. In number, they amounted to six or seven hundred, although some state it to have been **eight or nine hundred**. All were executed..."

**খ) সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৪৭-৪৪৯। সুন্নাহ আবু দাউদ, বুক ৩৮, নং ৪৩৯০**

**গ) মুহাম্মদের (আল্লাহ) বর্ণনা:**

৩৩:২৬- কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে **তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।**

৩৩:২৭- তিনি তোমাদেরকে **তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন**, যেখানে তোমরা অভিযান করনি।

**ইবনে ইশাক, সহি বুখারী ও আবু দাউদের সার সংক্ষেপ:**

**কেন এই রক্তের হোলী-খেলা?**

"আপাদ মস্তক ধুলা-ভর্তি শরীরে অস্ত্রসজ্জিত অশরীরী **জিবরাইল তার মাথার চুলের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে** খন্দক যুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী সদ্য স্নান-সম্পন্ন মুহাম্মদকে আক্রমণের আহ্বান জানালেন। **জিবরাইলের প্রশ্ন, "কেন তুমি অস্ত্র বিরতি দিয়েছ?** আল্লাহর কসম, আমি তো তা করি নাই। যাও তাদের আক্রমণ কর।" **মুহাম্মদ জানতে চাইলেন**, **"কোথায়"? জিবরাইল তখন বনি কুরাইজার দিকে নির্দেশ করলো।** জিবরাইলের নির্দেশে আল্লাহর নবী তার দল বল নিয়ে বনি কুরাইজা আক্রমণ ও ঘেরাও করলেন। নবী তার সহচর হাসান বিন তাবিতকে বললেন, **"তাদেরকে গালি-গালাজ করো। স্বয়ং জিবরাইল এই গালি-গালাজে তোমার সাহায্যে আছে।"**

তারপর বনি কুরাইজার গোষ্ঠী আত্ম সমর্পণ করলে, **আত্ম-সমর্পিত অবস্থাতেই** বনি কুরাইজার **সমস্ত "প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের"** (৭০০-৯০০ জন) প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাজারের নিকট পূর্ব থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তের কিনারায় একের পর এক সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ে **এসে একটা একটা করে 'গলা কেটে খুন** করে লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। কে প্রাপ্তবয়স্ক আর কে তা নয়, তা পুরুষাঙ্গের লোম (pubic hair) দেখে হয়েছিল নির্ধারণ! তাদের **সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদ হস্তগত করেন।** তাদের **যুবতী স্ত্রী-কন্যাদের করেন তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের যৌন দাসী। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের করেন দাসে রূপান্তরিত।** মুহাম্মদের দাবি, এই নৃশংস অমানবিক হত্যাকাণ্ড, সম্পত্তি দখল, উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে দখল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক (যারা কোনো অন্যায় করেনি) মুক্ত মানুষদের চিরদিনের জন্য দুঃসহ দাসত্বের শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করা **"আল্লাহর" পছন্দ!"**

পাঠক, অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত জনতার সামনে সৌদি আরবে **একজন** বাংলাদেশীর শিরশ্ছেদের 'বীভৎস'ভিডিও দৃশ্যটি ইন্টারনেটে দেখে অনেক দর্শকই অসুস্থ বোধ করেছিলেন। সে তুলনায় বনি কুরাইজার ঘটনা লক্ষ গুণ বেশি

বীভৎস ও জঘন্য (খুন-ধর্ষণ-লুট-দাসত্ব)! বনি-কুরাইজা ঘটনার উল্লিখিত বর্ণনার **লেখকগণ** বিশিষ্ট আদি মুসলিম চিন্তাবিদ। তাদের এ বর্ণনার **"উৎসে"** যাঁরা ছিলেন (যাঁদের কাছ থেকে গল্প গুলো সংগৃহীত), তাঁদের সকলেই প্রচণ্ড বিশ্বাসী বিশিষ্ট মুসলিম। ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী, তাঁরা তাঁদের বর্ণনায় এমন কিছু উল্লেখ করার ক্ষমতা রাখেন না, যা "মুহাম্মদকে হেয় প্রতিপন্ন' করতে পারে। সে ক্ষমতা তাঁদের নেই। কেন নেই, তার বিস্তারিত আলোচনা জ্ঞান পর্বে (দশম) করা হয়েছে। এ সকল বর্ণনা লেখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১২০-২২০ বছরের ও বেশি পরে। লেখক ও বর্ণনাকারীরা সেই সময়েরই বাসিন্দা, যখন মানুষের **"মানসিক বিভ্রম** (Psychosis)" সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল "এ বিভ্রমগুলো এক বিশেষ ক্ষমতা!" তাই এ উদ্ভট বর্ণনাগুলো এই ভয়াবহ গণহত্যাকাণ্ডের ন্যায্যতার সপক্ষে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা জানতেন না যে, শত-সহস্র বছর পরে তাঁদের লিখিত এই ঘটনাগুলো মুহাম্মদ ও তার সহচরদের অমানবিক কর্মকাণ্ডের **"উল্লেখযোগ্য"** দলিল হিসাবে চিহ্নিত হবে।

বলা হচ্ছে, **"জিবরাইল তার চুলের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে"** মুহাম্মদকে খবর দিয়েছেন। আর কেউ কি জিবরাইলকে দেখেছে? না, কেউ না! দেখেছে একমাত্র মুহাম্মদ! আর কেউ কি তার হুংকার শুনেছে? না, কেউ না! একমাত্র মুহাম্মদই তা শুনেছেন! বিজ্ঞানের অবদানে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, এই উপসর্গগুলো আদর্শ (Typical**) দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির বিভ্রম (hallucination)** ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সকল উপসর্গ **ভয়ংকর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রুগীদের (উন্মাদ)**। বিশেষ করে যারা এ রূপ **'Command hallucination"** এ আক্রান্ত। এ উপসর্গের সাথে প্রায়ই যোগ হয় **সন্দেহ-বাতিক** (Paranoid delusion) এবং তখন তা হয় আরও বিপজ্জনক ও মারাত্মক (deadly)। রুগী ও তার পরিপার্শ্বের মানুষদের **নিরাপত্তার খাতিরে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তৎক্ষণাৎ (Psychiatric emergency) এ সকল উন্মাদ রোগীকে মানসিক হাসপাতালের "তালাবদ্ধ (Locked unit) কক্ষে" ভর্তি করা হয়।** বিষয়টি

এতই জরুরী যে, এ সমস্ত রোগী যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে তাকে আইন শৃঙ্খলা/নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় জবরদস্তিরূপে (Involuntary commitment) হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, **মুহাম্মদ কি আদৌ উন্মাদ ছিলেন?** কোনো উন্মাদ ব্যক্তি কি নিখুঁত ও সময়োচিত পরিকল্পনা করে জগৎ বিখ্যাত সমরনায়ক হতে পারেন? খুবই যুক্তিসম্মত প্রশ্ন! মুহাম্মদ যে মানব ইতিহাসের একজন সফল সমরনায়ক (Warrior), এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। তাই এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের **"অধিকাংশ সময়ে"** মানসিক বিভ্রমে আক্রান্ত কোনো মানুষের পক্ষে এহেন হিসেবী পদক্ষেপ অসম্ভব! সুতরাং, **"ক্বচিৎ কদাচিৎ"** মতিভ্রম অথবা মৃগী (Epilepsy) উপসর্গে আক্রান্ত হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই মুহাম্মদ যে শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন না, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। **তিনি যা কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেছেন।** ওহী প্রাপ্তির উপসর্গ থেকে শুরু করে জিবরাইল ও জ্বিনের দর্শন/শ্রবণসহ তাঁর জীবনের সমস্ত কার্যকলাপই করেছেন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে! All are goal directed activities. বনি কুরাইজার ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়! কুরান-সিরাত হাদিসের আলোকে সে সত্যটি আজ স্পষ্ট। উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে তিনি যে **"মিথ্যা ও প্রতারণার"** আশ্রয় নিতেন, তার প্রমাণ ভুরিভুরি (ওপরের দৃষ্টান্ত)!

মানবতার মাপকাঠিতে মুহাম্মদ কখনোই "শ্রেষ্ঠ মানব" ছিলেন না। তাঁর নিজেরই জবানবন্দী (কুরান)-এর **সম্পূর্ণ বিপরীত** সাক্ষ্যবাহী। কিন্তু মুহাম্মদ মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ **"সফলকাম"** ব্যক্তিদের একজন। তিনি আরবের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোত্রকে ইসলাম নামের 'পতাকাতলে' সমবেত করে এক শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহচররা সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে **'আরব সাম্রাজ্যবাদ"** কায়েম করেন। মুহাম্মদের সাংগঠনিক দক্ষতা,

কারিশমা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, চতুরতা, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি **নৃশংস সন্ত্রাসী (terror) কর্মকাণ্ডই (বুখারী: ৪:৫২:২২০)** ছিল তার সাফল্যের চাবি কাঠি। তিনি ছিলেন চতুর পলিটিশিয়ান। তার নীতি ছিল, **"The end justifies the means".** লক্ষ্য অর্জনে যা কিছু প্রয়োজন, সবই তিনি করেছেন তাঁর কল্পিত আল্লাহর নামে। অমুসলিমদের প্রতি যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, খুন, সন্ত্রাস, প্রহসন, ঘৃণা, লুট, ধর্ষণ, ভীতি ও প্রলোভন (দুনিয়া ও আখিরাত) সবই বৈধতা পেয়েছে তাঁর সে নীতিতে। **সাধারণ মুসলমানেরা ইসলামের আদি উৎসে বর্ণিত এ সব অমানবিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! পরিকল্পিতভাবে তা গোপন রাখা হয়েছে, অথবা বৈধতা দেয়া হয়েছে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে! যুগে যুগে যরাই এ সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তাদেরকেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে।**

ইসলাম বিশ্বাসীদের বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, **বনি কুরাইজা খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করেছিলেন** বলেই মুহাম্মদ তাদের কে আক্রমণ ও খুন করেছিলেন। তাদের এই বিশ্বাস যে কী পরিমাণ **"নির্লজ্জ ও মিথ্যা অপ-প্রচারণার ফসল"** তার সাক্ষী কুরান হাদিসের বর্ণনা। যে মুহাম্মদ শক্তি না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাঁর সাথে ভিন্নমতের কারণে নিজের **নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ দেন,** ক্বাব, আবু-রাফি এবং সামান্য কবিতা লেখার অপরাধে "জননীকে" করেন খুন। মক্কা বিজয়ের পর **দশ জন পুরুষ ও নারীকে** (অপরাধ: দশ বছরেরও বেশি আগে তাঁরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন) যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই (এমনকি তা যদি ক্বাবার মধ্যেও হয়) **খুন করার রায় দেন;** সেই একই মুহাম্মদ তাঁর শত্রুপক্ষকে সাহায্যকারী বনি কুরাইজার "দুশমনি" বেমালুম ভুলে গিয়ে বাসায় এসে "গোসল করতেছেন!" এমনকি জিবরাইল এসে তাঁকে তা মনে করিয়ে দেয়ার পরও বুঝতে না পেরে জিবরাইলকেই জিজ্ঞাসা করছেন, **"কোথায়** তাকে আক্রমণ করতে হবে!" এ সব উদ্ভট বর্ণনার মাধ্যমে বনি কুরাইজাকে **"দোষী সাব্যস্ত করার কসরত"** আরব্য উপন্যাসের গল্পকেও হার মানায়। বানু-কুরাইজার

অত্যন্ত করুণ এই ঘটনা মুহাম্মদের বহু বহু নিষ্ঠুরতার একটি। বনি কুরাইজার কোনো সদস্য মুহাম্মদ কিংবা মুসলমানদের কোনোরূপ আক্রমণ করেননি। They never attacked Muslims! সত্য হচ্ছে, বনি কুরাইজা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ **'সম্পত্তি-নারী-দাস' দখল (৩৩:২৭)!**

Let us forget about everything! পাঠক, আসুন, আমরা যুক্তির খাতিরে ধরে নিই যে, এ সব **"উদ্ভট আরব্য-উপন্যাসীয় বর্ণনা**"সবই সত্য! বনি কুরাইজা তাদের দুর্গের মধ্য থেকে কুরাইশদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যা মুহাম্মদ ভুলে গিয়েছিলেন এবং জিবরাইলের মারফত তা জ্ঞাত হয়েছেন। সে অপরাধে তাদের **প্রত্যেকেটি প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষকে আত্ম সমর্পিত ও বন্দী অবস্থায় খুন, ভূমি দখল, শিশু (নিষ্পাপ) ও আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের দাসে রূপান্তর**কারীকে কি কোনোভাবে **"অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (৬৮:৪)",** কিংবা **"বিশ্ববাসীর রহমত (২১:১০৭)"**, কিংবা, **"মানব জাতির ত্রাণকর্তা (৩৪:২৮)"** ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করা যায়? যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এমন দাবি করেন, তাঁদেরও কি আদৌ সুস্থচিন্তার অধিকারী ও বিবেকবান বলা যায়?

## "নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ" এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রার শুরু

পাঠক, আসুন, আমরা আবু লাহাব কে কী কারণে "অভিশাপ" দেয়া হয়েছিল তা নির্মোহ মানসিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করে **"সত্য"** অনুধাবনের চেষ্টা করি। ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খৃষ্টাব্দ) ও আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা মতে "সুরা লাহাব" নাজিল হয় মুহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির বছর তিনেক পরে। মুহাম্মদ তার নবুয়ত প্রাপ্তি ঘোষণার প্রথম তিন বছর (৬১০-৬১৩ সাল) তার বাণী প্রচার করেন গোপনে। এই সুরার শানে নজুলে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ **"সর্বপ্রথম**

**প্রকাশ্যে”**তার বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন “আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪)” ওহী প্রাপ্তির পর পরই। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ **(৫):**

**সহি বুখারী: ভলিউম-৬, বই-৬০, নং-২৯৩**

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত,

***'আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪)' আয়তটি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাফা পাহাড়ের উপর উঠে "হে বনি ফিহির! হে বনি আদি" এভাবে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে সেখানে সমবেত হওয়ার আগ পর্যন্ত ডাকতেই থাকলেন। যারা সমাবেশে আসতে পারলেন না, তারা তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা পাঠালেন সেখানে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য। আবু লাহাব ও অন্যান্য কুরাইশরা সেখানে সমবেত হলে নবী বললেন, "যদি আমি বলি যে, একদল শত্রুসেনা তোমাদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান নিয়েছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?" উপস্থিত কুরাইশরা বললেন, "হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদাই সত্যবাদী বলে জানি।" তারপর নবী বললেন, "আমি তোমাদেরকে চরম শাস্তির (terrific punishment) সতর্কতাকারী।" আবু লাহাব (নবীকে) বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার হাত! এ কারণেই কি তুমি আমাদেরকে ডাকাডাকি করে একত্রিত করেছ?" তখন নাজিল হলো:" আবু লাহাবের (নবীর চাচা) হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে ---(১১১: ১-৫)”। - (অনুবাদ: লেখক)***

**মুহাম্মদের চরিত্র বোঝার জন্য এ সুরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।** মুহাম্মদ কেমন লোক ছিলেন, তার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় এই সুরা লাহাব ও তার শানে-নজুলের বর্ণনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ঘটনার বিশ্লেষণে আমরা জানছি:

১) মুহাম্মদ সর্বপ্রথম **প্রকাশ্যে** তার মতবাদ প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, “আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন” ধারনাটি পাওয়ার পর। সেই অনুষ্ঠানেই মুহাম্মদ তার একান্ত নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ বর্ষণ করেন। অর্থাৎ, ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রার প্রারম্ভই হয়েছে "অভিশাপ বর্ষণ"-এর মাধ্যমে!

২) মুহাম্মদ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিনা নোটিশে বিভিন্ন গোত্রের কুরাইশদেরকে সেখানে সমবেত না হওয়া পর্যন্ত **ডাকাডাকি** করেছিলেন।

৩) তারপর লোকজন 'কী ব্যাপার', তা জানার জন্য সমবেত হলে প্রথমে তিনি তাদেরকে **শত্রুপক্ষ আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন** করেন। এহেন ঘোষণায় কুরাইশদের ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমত ঘোষণাকারীকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তা সে চরম সত্যবাদী বা সাধারন সত্যবাদী যে-ই হোক না কেন। কারণ শত্রুপক্ষের আক্রমণ সে আমলে কোনো অবাস্তব বিষয় ছিল না। যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি এমত ঘোষণাকারী হলেও তাকে অবিশ্বাস করে 'আক্রান্ত হবার" ঝুঁকি কোনো জনপদই নেবে না। তবে ব্যক্তিটি যদি সে জনপদের **সর্বজনবিদিত "মিথ্যুক" হোন,** সেক্ষেত্রে হয়তো এর ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। নতুবা নয়। তাই সহি বুখারীর এই হাদিসটির বর্ণনায় উপস্থিত কুরাইশদের "হ্যাঁ" জবাবটির জন্য **"কারণ আমারা আপনাকে সর্বদাই সত্যবাদী বলে জানি"** একান্তই অনাবশ্যক।

৪) তারপর তিনি কুরাইশদের তাঁর কল্পিত আল্লাহর **"চরম শাস্তির হুমকি**”প্রদর্শন করে তাঁর মতবাদ মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

৫) মুহাম্মদের এহেন **শঠতায়** (আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিনা নোটিশে বিভিন্ন গোত্রের কুরাইশদেরকে ডাকাডাকি করে লোক সমাগম, ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির ভয়

দেখিয়ে নিজের দলে টানার চেষ্টা) **আবু লাহাব ক্রোধান্বিত হয়ে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন।**

৬) মুহাম্মদ তার ব্যবহারে কোনোরূপ অস্বাভাবিকতা শুধু যে দেখতে পাননি, তাইই নয়, উল্টা আবু লাহাবকে তাঁরই উচ্চারিত বাক্য দিয়ে **"অভিসম্পাত"** করেন। একই সাথে আবু লাহাবের স্ত্রীকেও করেন অভিসম্পাত।

**এই পুরো ঘটনাটির জন্য দায়ী মুহাম্মদ!** তিনিই কুরাইশদের ডাকাডাকি করে প্রথমে "শত্রু আক্রমণের ভয়" এবং পরে তাঁর দলে শরীক না হলে "চরম শাস্তির ভয়" দেখান। এমত পরিস্থিতিতে কেউ যদি "আহ্বানকারীর" ওপর বিরক্ত হন, তবে সেটার দায় কার? আহ্বানকারীর? নাকি প্রতিবাদকারীর? নিঃসন্দেহে আহ্বানকারীর। এই সহজ সত্যটি **যারা বুঝতে অক্ষম,** তাদেরকে অনুরোধ করি কল্পনা করতে যে, তার এলাকায় একইভাবে কোনো আহ্বানকারী এসে বিনা নোটিশে তাকে এবং তার এলাকাবাসী বিভিন্ন গণ্যমান্য মুসলমানদের হাঁকাহাঁকি করে ময়দানে ডেকে নিয়ে "ইসলাম একটি ভুয়া বিশ্বাস এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের অনন্ত আগুন" ঘোষণা দিয়ে আহ্বানকারীর আবিষ্কৃত কোনো এক 'নতুন ধর্ম'গ্রহণের ক্যানভাস শুরু করলেন। তারপর সমাগমে আগত কোনো একজন বিরক্তি প্রকাশ করে তার কাজের প্রতিবাদ করলে তিনি উল্টা সেই প্রতিবাদকারীকে অভিশাপ দিলেন। প্রতিবাদকারীর স্ত্রীকে অভিশাপ দিলেন। তারপর, তার সমর্থকরাও যেন সেই প্রতিবাদকারী ও তার স্ত্রীকে অনন্তকাল ধরে অভিশাপ দেন, তার ব্যবস্থাও করলেন! জারী করলেন যে, এ অভিশাপ মিশ্রিত বাণী 'তেলাওয়াত' করলেও অশেষ পুণ্য মিলবে! **এমন মানসিকতা ও চরিত্রের অধিকারী** আহ্বানকারীকে কি সৎ, সহিষ্ণু, বিবেকবান, নীতিবান ইত্যাদি যাবতীয় গুনে গুণান্বিত ব্যক্তি হিসাবে **"ভূষিত"** করা যায়? **"বিবেচনা"**ও কি করা যায়? কিংবা **"কল্পনা"**?

যতদিন 'ইসলাম' টিকে থাকবে, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান মুহাম্মদের চাচা ও চাচীকে অভিসম্পাত করতেই থাকবেন পরম একাগ্রতায়। 'ঐশী বাণী' বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানসে সকল ঐশী বাণীই পবিত্র। পালিত হয় তা একাগ্রচিত্তে! হোক না তা ঘৃণা বা অভিশাপ! কিংবা হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান বা দোষারোপ! অথবা ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ। মানবমস্তিষ্কে "বিশ্বাস" এমন একটি অবস্থান (Condition), যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ বৃত্তিকে অবশ করে দেয়। আমি নিজে খুব ভাল বিশ্বাসী ছিলাম জীবনের অনেকগুলো বছর (৬). জানতাম কম, মানতাম বেশি। যেটুকু জানতাম তার কোথাও **"অসামঞ্জস্য"**-এর কোনোকিছুই ধরতে পারতাম না। যাঁরা তা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন, তাদের সাথে তর্কে মেতে উঠতাম। ইসলাম সত্য, কুরান সত্য, মুহাম্মদ সত্য। এর বাহিরে সবকিছুকেই "মিথ্যা" বলে মনে হতো। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে সত্যকে আবিষ্কার করতে ভাবনার নিরপেক্ষতা (unbiased thinking) অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বাস ও ভাবাবেগ (Emotion) সহজাত বিচার বুদ্ধির অন্তরায়।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

**তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:**

(১) **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬,** translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald,

[State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১০৮৩-১০৮৪

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

**"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৫৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

(২) Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৪৬**

(৩) Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৯**
Ibid **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"-আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৭৫-১১৭৭**

(৪) অল্প কিছু উদাহরণ:

১) ক্বাব বিন আশরাফ নৃশংস হত্যাকাণ্ড - বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৬৯
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5686-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-369.html

২) আবু আফাক নৃশংস হত্যাকাণ্ড - বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html

৩) পাঁচ সন্তানের মা আসমা-বিনতে মারিয়াকে খুন

৪) বানু কুরাইজার গণহত্যাযজ্ঞ (বিস্তারিত আলোচনা পর্ব: ৮৭-৯৫):

সহি বুখারী, ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৪৭ - ৪৪৯,

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5608--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-447.html

সুন্নাহ আবু দাউদ, বুক ৩৮, নং ৪৩৯০

http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-dawud-book-033-hadith-number-4390.html

Narated By Atiyyah al-Qurazi: I was among the captives of Banu Qurayzah. They (the Companions) examined us, and those who had begun to grow hair (pubes) were killed, and those who had not were not killed. I was among those who had not grown hair.

Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯**

(৫) সহি বুখারী: ভলিউম ৬, বই ৬০, নম্বর ২৯৩

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5302-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-293.html

Ibid **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ১১৭; ibid আল-তাবারী-পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৭০-১১৭১**

(৬) ভিডিও: ৫ মিনিট

https://www.youtube.com/watch?v=u9LPwA7FRZ4&feature=player_embedded

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৩: উদ্ভট তত্ত্ব

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মানব জাতির জ্ঞানার্জনের সহায়তায় অন্যান্য আর যে সমস্ত বাণী বর্ষণ করেছেন, তার আরও কিছু নমুনা:

## ১) ৩০৯ বছর নিদ্রামগ্ন!

১৮:১১-১২- তখন আমি **কয়েক বছরের জন্যে** গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

>>> **কত দিন ঘুমিয়ে ছিলেন?** **এক লক্ষ বারো হাজার সাত শত পঁচাশি দিন!** কোনো খাদ্য ও পানীয় ছাড়া একজন মানুষ সর্বোচ্চ কত দিন বাঁচতে পারে?

## ২) একশ বছর মৃত অবস্থায় থেকে ফের উঠে বসা!

২:২৫৯- তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অত:পর আল্লাহ্ **তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর|**

তারপর তাকে উঠালেন| বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়| বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে।...

**>>>মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!**

## ৩) সুর্যের অস্তাচল ও উদয়াচলের স্থান!

১৮:৮৬- অবশেষে তিনি (জুলকার নাইন) যখন **সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন;** তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

১৮:৯০- অবশেষে তিনি **যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন,** তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

>>> এই নিরেট উদ্ভট (utterly nonsense) বর্ণনাটিকে বৈধতা দিতে চরম বিশ্বাসীরা মরিয়া হয়ে যে-প্রতারণাটির আশ্রয় নেন, তা মোটামুটি এ রকম: "এটা জুলকারনাইনের বর্ণনা! জুলাকারনাইনের কাছে যা মনে হয়েছিল, তা-ই তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ তো বলে নাই যে সূর্যের উদায়চল/অস্তাচলের স্থান আছে।" Really! ১৮:৮৬ এবং ১৮:৯০ **অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে:**

(১) **"অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে/উদয়াচলে পৌছলেন"; অত:পর,**

(২) "তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে /... উদয় হতে দেখলেন"

সূর্যকে সমুদ্রে অস্ত যেতে কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের ওপর উদয় হতে জগতের সকল মানুষই অনন্তকাল ধরেই দেখে আসছে। এটা কি কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়? এখানে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, "অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে/উদয়াচলে পৌঁছলেন।" এর পরও যদি কোনো পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে তিনি সহি বুখারীর ৪:৫৪:৪২১ অথবা ৬:৬০:৩২৬ হাদিসটির সহায়তা নিতে পারেন। মুহাম্মদ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার বিশিষ্ট সাহাবী আবুজর গেফারী (রাঃ) কে জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন:

বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪২১

মাওলানা আজিজুল হকের অনুবাদ (৬.১৯১৭)

আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন:

একদা আমি সূর্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, **সূর্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে।** তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)।

অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে—যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের, 'সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ -(৩৬:৩৮)।

### ৪) দুই সমুদ্রের মাঝখানে অদৃশ্য অন্তরায়!

২৫:৫৩- তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; **উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।**

৫৫:১৯-২০- তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। **উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।**

**>>> আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে উভয়ের মাঝখানে কোনই অন্তরায়/অন্তরাল নেই।** নদীর মিষ্ট পানি সমুদ্রের লোনা পানির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প ঘনত্বের। যখন নদীর পানির ধারা সমুদ্রে মিলিত হয় তখন লোনা পানিটি থাকে নীচের স্তরে (বেশী ঘনত্ব) আর নদীর পানিটি উপরের স্তরে। আরবরা বহু যুগ ধরেই সমুদ্র পথে ব্যবসা করে আসছেন। তাদের কাছে এ বিষয়টি কখনোই অজানা ছিল না, মুহাম্মদের কাছেও তা অজানা থাকার কথা নয়। এই প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞানের সাথে মুহাম্মদ জুড়ে দিয়েছেন "উভয়ের মাঝখানে অন্তরায়' যা নি:সন্দেহে অসত্য। ভিন্ন ধারার এ স্রোত দুটি একে অপরের সাথে শুরু থেকেই অনবরত: মিশ্রিত হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ হতে লাগে সময়। দূরে গিয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে হয় একই ঘনত্ব-প্রাপ্ত, একই ধারা। তাই, ২৫:৫৩ এর **"দুর্ভেদ্য আড়াল"** আর ৫৫:২০ এর **"যা তারা অতিক্রম করে না"** একেবারেই আজগুবি।

## ৫) ঝুলাও রশি আকাশ পর্যন্ত!

২২:১৫- সে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনই ইহকালে ও পরকালে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে **একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক**; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।

**>>> আকাশ কি কোন কঠিন বস্তু যে তাতে রশি ঝুলানো যায়?** নি:সন্দেহে মুহাম্মদ আকাশকে **কঠিন ছাদ** মনে করেছিলেন! খালি চোখে মেঘমুক্ত আকাশকে শক্ত ছাদ ছাড়া আর কিছু কী মনে হয়? অন্যত্র মুহাম্মদ(আল্লাহ) ঘোষনা দিয়েছেন, "–নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর **মজবুত সপ্ত-আকাশ** (৭৮:১২)!

## ৬) রাত্রি যদি হয় কেয়ামত পর্যন্ত!

২৮:৭১– বলুন, ভেবে দেখ তো, **আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন,** তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য **কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে?** তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?

>>> নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর (আল্লাহ) দিন ও রাত্রির কারণ অথবা জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে সামান্যতম ধারনাও ছিল না। থাকলে কিয়ামত দিন পর্যন্ত রাত্রিকে বিলম্বিতের উদ্ভট সম্ভাবনার উল্লেখ করতেন না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীকে হতে হবে হয় "সূর্যহীন অথবা সূর্যালোক বঞ্চিত।" **সেই সূর্যহীন বা সূর্যালোক বঞ্চিত পৃথিবীতে "প্রাণের উদ্ভব" হবে কোত্থেকে?** চূড়ান্তভাবে সূর্যই যে পৃথিবীর সকল প্রাণ-শক্তির উৎস (Ultimate source of Energy), এ ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? রাত্রিকে যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করানো হয়, তবে আর আমাদের কারোরই আলোর প্রয়োজন হতো না। কারণ সে অবস্থায় পৃথিবীতে **কোনো প্রাণেরই অস্তিত্ব থাকতো না।** যেখানে কোনো প্রাণই নেই সেখানে, "কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে" বাণীটি যে **অর্থহীন উদ্ভট প্যাচাল**, সে ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? মানুষের বেঁচে থাকার সবচেয়ে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো **অক্সিজেন।** যা না থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষ সহ যাবতীয় অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ হবে। এই অক্সিজেনের তৈরি হয় **দিনের আলোতে।** সবুজ

উদ্ভিদের **সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার** মাধ্যমে। তাই দিনের আলো না থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মানুষসহ যাবতীয় অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

সুতরাং, নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, অক্সিজেন, তার অত্যাবশ্যকীয়তা এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে প্রবক্তা মুহাম্মদ স্বাভাবিক ভাবেই সামান্যতম ধারণারও অধিকারী ছিলেন না। থাকলে তিনি আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে "রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করার" উদাহরণ মনুষ্যকুলকে শোনাতেন না!

## ৭) আদি মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল ৯৫০ বছর!

২৯:১৪- আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। **তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।** অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবণ গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী।

>>> ৯৫০ বছর বয়সের জীবিত মানুষ! কবে? কখন? কোথায়? বিজ্ঞানের বদৌলতে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, এ তথ্য **একেবারেই উদ্ভট!** বিজ্ঞান এর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী। খোলা আকাশের নিচে বন-জংগল-গুহায় অবস্থান, প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও বন্য পশুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞতা এবং জীবাণুনাশক ঔষধ (Antibiotic) বঞ্চিত পরিবেশে শিশু ও মা মৃত্যু (Infant and Maternal mortality rate) সহ অন্যান্য যাবতীয় মৃত্যুর হার আদি যুগে ছিল এখনকার তুলনায় অনেক অনেক বেশী। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সে রকম পরিবেশে আমাদের পূর্ব পুরুষদের **গড় আয়ু** ছিল মোটামুটি **১৫-২৫ বছর।** ৩০,০০০ বছরের বেশী আগের পৃথিবীর মনুষ্য পরিবারে জীবিত দাদা-দাদী/নানা-নানীদের (Grand parents) সংখ্যা ছিল স্বল্পই। অল্প বয়সে বেশির ভাগ মানুষেরই

মৃত্যু হবার কারণে কোনো পরিবারে একই সাথে জীবিত তিন-পুরুষের (Three generation) অবস্থান ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তাই নুহ (আঃ) এর ৯৫০ বছর জীবিত থাকার বয়ান মুহাম্মদের বহু **"প্রলাপ"**-এরই একটি!

## ৮) জ্যান্ত মাছের পেটের ভিতরে বসে তসবীহ পাঠ!

৩৭:১৪২-১৪৪- অতঃপর একটি মাছ তাঁকে (ইউনুস আঃ) গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। **যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।**

>>> জীবন্ত মাছের পেটের মধ্যে বসে বসে মানুষের তসবিহ পাঠ! কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে জীবন্ত মানুষ! **বর্ণান্ধ (Color Blind) ও ধর্মান্ধ (Religious Blind) ব্যক্তির মধ্যে মিল এই যে, প্রথম জন শারীরিক প্রতিবন্ধী, আর দ্বিতীয়জন মানসিক প্রতিবন্ধী।** **বর্ণান্ধ** ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট "রং" দেখতে পান না। সেই নির্দিষ্ট রংটি ছাড়া অন্যান্য রং চিনতে তার কোনই অসুবিধা হয় না। তার "অন্ধত্ব" শুধু একটি নির্দিষ্ট রংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তেমনি একজন **ধর্মান্ধ** ব্যক্তি তাঁর নিজ ধর্মগ্রন্থে "উদ্ভট" কোন কিছুই খুঁজে পান না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের ধর্মটি ছাড়া অন্য ধর্মগ্রন্থের যাবতীয় উদ্ভট গল্প তিনি অবলীলায় শনাক্ত করতে পারেন। একজন ধর্মান্ধ মুসলমান বেদ ও বাইবেলের যাবতীয় অসংগতি, অবাস্তবতা ও অবৈজ্ঞানিক বিষয় অতি সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি 'কোরানের' অসংগতি, অবাস্তবতা ও অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুই বুঝতে পারেন না। একইভাবে কোনো ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান পারেন না তাঁর বাইবেলের অসংগতি ও অবাস্তবতা বুঝতে। তিনি পারেন কোরান ও বেদের বাণীর অসারতা বুঝতে। জ্যান্ত মানুষকে কোনো মাছ গিলে ফেললে অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষটির ভবলীলা সাঙ্গ হবে, তা যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন। তা সে তসবিহ পাঠ করুন আর

না-ই করুন! কী উদ্ভট বর্ণনা, **"যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত"!** **পৃথিবীতে এমন কোনো মাছ আছে কি, যার আয়ু হতে পারে "কিয়ামত তক"?**

উদ্ভট! উদ্ভট! উদ্ভট! এহেন বহু উদ্ভট ও অবাস্তব গল্পে ভরপুর মুহাম্মদের (আল্লাহ) বাণী সমষ্টির সঙ্কলনকে যারা "অভ্রান্ত বিজ্ঞানময় কেতাব" রূপে আখ্যায়িত করেন, সে জনগোষ্ঠী যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রগতিতে পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানটি অধিকার করবেই সে ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে?

**পুনশ্চ: "একটিই যথেষ্ট, দুইটি অতিরিক্ত"**

শুধু "একটি মাত্র" ভুল-অবাস্তব অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যাবে যে কুরান 'বিশ্ব-স্রষ্টার' বাণী হতে পারে না । সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের দাবি মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা মানসিক বিভ্রম।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৪: কুরান কার বাণী?

## কুরান কিতাবটি আসলে কী?

কোনো ইসলাম বিশ্বাসীকে যদি এ প্রশ্নটি করা হয়, তবে তার দ্বিধাহীন জবাব হবে, **"এটি আল্লাহর কথা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের কথা।** যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর জিবরাইল মারফত নাজিল হয়েছে।" তাঁরা আরও দাবী করবেন, "যেহেতু এই গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য বিশ্বস্রষ্টার, তাই এ কিতাবে কোনো ভুল থাকতে পারে না।" মুসলিমদের যে কোনো ধর্মীয় আলোচনা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যটি সবার আগে উদ্ধৃত হয় তা হলো, "আল্লাহ পাক (বিশ্বস্রষ্টা) কুরানে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন...। **কেন তারা এমনটি বলেন? তাদের এ দাবীর উৎস কী?**

## উৎস হলো মুহাম্মদ!

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবী, স্বয়ং "বিশ্বস্রষ্টা" ফেরেশতা জিবরাইল মারফত তাঁর কাছে বার্তা প্রেরণ করেছেন। জিবরাইল তাঁর শরীরে ভর করে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছেন। আর জিবরাইলের আছরে যা কিছু তিনি বলেছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয়! কথাগুলো স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার! মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে বিশ্বাস করে বলেই ঘোষণা দেন, "কুরান আল্লাহর (বিশ্বস্রষ্টার) বাণী"। **মুহাম্মদের ভাষায়:**

৬৯:৪৩- **এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।**

৫৬:৭৭-৮০- নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, --। **এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।**

৮০:১৩-১৫- এটা **লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে**

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি জনসংখ্যার **প্রতি ১০০ জনের ৭৬ জনই ইসলাম ধর্মাম্বলী নন।** তাঁরা অমুসলিম। অমুসলিমরা কখনোই কুরানের বাণীকে 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী এবং মুহাম্মদক 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী-প্রাপ্ত মহাপুরুষ হিসাবে বিশ্বাস করেন না। তাহলে সত্য কোনটি? শতকরা ৭৬ জন লোক যা বিশ্বাস করেন না, সেটি? নাকি শতকরা ২৪ জন মানুষ যা বিশ্বাস করেন, সেটি? সত্য কোনো ভোটাভুটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এই দু'-দলের যে কোনো একদল 'সত্য' এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্য দল "মিথ্যা"। দু'-দল একই সাথে কখনোই "সত্য" হতে পারে না। সত্যকে জানার জন্যই প্রয়োজন **বস্তুনিস্ঠ পর্যালোচনা** (Objective analysis)। এর কোন বিকল্প নেই!

আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমাদের এই নিবাস পৃথিবীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি স্থান। এ স্থানটি সূর্যের তুলনায় ১৩ লক্ষ গুন ক্ষুদ্রতর। আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবাসটি জীবন ও আলো দানকারী সূর্য থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী। আলোর গতি ধ্রুব (Constant) - প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল (এক আলোক-সেকেন্ড); অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে সাত বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ। প্রতি দিনে (এক আলোক-দিন) ১৮০০ কোটি মাইল। প্রতি বছরে (এক আলোকবর্ষ) ৬০০ হাজার কোটি (৬ ট্রিলিয়ন) মাইল। এই গতিবেগে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আমাদের এই মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি এক লক্ষ আলোকবর্ষ

পরিবৃত একটি স্থান। **মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি** মহাবিশ্বের প্রায় ৮,০০০ কোটি (৮০ বিলিয়ন) অনুরূপ গ্যালাক্সির একটি। আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গ্যালাক্সিটি **(এ্যান্ড্রোমেডা)** ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ এ্যান্ড্রোমেডার যে অলোক-রশ্মি আজকে পৃথিবীতে পড়েছে, তা সেখান থেকে ২৫ লক্ষ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল!

তুলনায়, আধুনিক **মানুষের উদ্ভব হয়েছে মাত্রদুই লক্ষ বছর আগে!** আমাদের এই মহা-বিশ্বটি প্রায় ৯,৩০০ কোটি (৯৩ বিলিয়ন) আলোকবর্ষ পরিবৃত একটি স্থান। যে স্থানে পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুন বিশাল সূর্যের অবস্থান পৃথিবীর একটি ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্রতর। দৃশ্যমান জগতের এ সমস্ত "সংখ্যা" যে কোনো সুস্থ-চিন্তাশীল মানুষের কল্পনা শক্তিকে অবশ করে দেয়। মানুষকে নতজানু হতে শেখায়। ভাবতে শেখায়। পুরাতন সবকিছুকে ভুলে নতুন জ্ঞানের আলোকে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে সত্যিকার চিন্তাশীল মানুষ হতে স্পৃহা যোগায়!

আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে প্রায় ১৩৫০ কোটি বছর আগে। তার প্রায় ৯০০ কোটি বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই পৃথিবী। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আরও ১০০ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে "প্রাণের (Life) উদ্ভব হয়েছে।" প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে। সেই আদি থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রজাতির (Species) উদ্ভব হয়েছে তার ৯৯ শতাংশেরও বেশী নিশ্চিহ্ন/বিলুপ্ত (Extinct) হয়ে গিয়েছে। মাত্র এক শতাংশ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যার বর্তমান পরিমাণ **আনুমানিক ১৭ লক্ষ।** বর্তমান পৃথিবীর এই ১৭ লক্ষ প্রজাতির একটি হলাম আমরা - Homo sapiens. এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে, এমন কোনো প্রমাণ নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপরোক্ত ৬৯:৪৩, ৫৬:৭৭-৮০ এবং ৮০-১৩-১৫ বাণীসমষ্টিকে একটু মনোযোগের সাথে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, উক্ত বাক্যগুলো দিয়ে মুহাম্মদ দাবী করছেন:

১) কুরান বিশ্ব-স্রষ্টার (আল্লাহ) বাণী। **"সেই" বিশ্বস্রষ্টা** তা লিখে রেখেছেন, 'সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে' (৮০:১৩-১৫)। প্রায় **১৩৫০ কোটি** বছর আগে তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। তারপর,

২) তিনি **"৯০০ কোটি বছর অপেক্ষা**"করে 'পৃথিবী' নামক অতিশয় ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র স্থানকে সৃষ্টি করেন। তারপর,

৩) তিনি **"আরও ১০০ কোটি বছর অপেক্ষা**"করে পৃথিবীতে প্রাণ (Life) সৃষ্টি করেন।

৪) তারপর, **"আরও ৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষা"**করেন। অপেক্ষার এই সময়টি তে তিনি পৃথিবীর প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রজাতিকে (species) নিশ্চিহ্ন/অবলুপ্ত করে দেন! মাত্র এক শতাংশকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন, যার বর্তমান পরিমাণ আনুমানিক ১৭ লক্ষ।

৫) তারপর. এই ১৭ লক্ষ প্রজাতির মধ্য থেকে **মানুষ প্রজাতিকে** বাছাই করেন!

৬) তারপর এই মানুষ প্রজাতির কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে **একজনকে** 'আখেরি নবী হিসাবে' নির্বাচিত (Select) করেন। কাকে? মুহাম্মদের দাবী (স্বঘোষিত), সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সেই ব্যক্তিটিই হচ্ছেন 'তিনি'! **মুহাম্মদ বিন আবেদ-আল্লাহ** বিন আবদুল মুত্তালেব বিন হাশিম বিন আবেদে মানাফ বিন কুসে বিন কিলাব! কিসের

ভিত্তিতে এই নির্বাচন? মুহাম্মদের দাবী, **"প্রণয়ের (ভালবাসা) ভিত্তিতে!"** তার দাবী, তিনি হলেন 'সেই'সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র! তারপর,

৭) সেই সৃষ্টিকর্তা **"আরও চল্লিশ বছর অপেক্ষা"**করেন। অতঃপর, শৈশব-কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত চল্লিশ বছর বয়সী মুহাম্মদের উপর 'সেই বাণী' জিবরাইল মারফত মক্কায় হেরা পর্বতের গুহায় ৬১০ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে নাজিল করা শুরু করেন। তারপর,

৮) সেই সৃষ্টিকর্তা ১৩৫০ কোটি বছর আগে লিখিত-গচ্ছিত তার বাণীগুলো (কুরান) **মুহাম্মদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে** একটু একটু করে জিবরাইল মারফত সরবরাহ করতে লাগলেন। ঘোষণা দিলেন যে, এই বাণীগুলোই (কুরান) হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে "সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একমাত্র সহি" জীবন বিধান।

**কিন্তু**

৯) মুহাম্মদ ও তার সেই পরাক্রমশালী-সর্বজ্ঞানী-সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার সর্বাত্মক আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও **দীর্ঘ ১২-১৩ বছরে (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ)** সমাজের নিম্নশ্রেণীর **মাত্র ১২০-১৩০ জন** এর বেশি মানুষকে তার তাদের দলে সামিল করাতে পারলেন না! **আফসোস!** তারপর,

১০) অবস্থা আরও বেগতিক হলে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের আদেশ জারি করলেন "নির্বাসন"নিতে। প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনায়। নিজেও রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি **"স্বেচ্ছা নির্বাসন (হিজরত)"** নিলেন মদিনায় (সেপ্টেম্বর, ৬২২)!

ইসলামী জাহানের বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত বিশ্বাস এই যে, কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, মৃত্যুহুমকির বশবর্তী হয়ে, প্রাণরক্ষার তাগিদে মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। **বনি কুরাইজাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মতই এ দাবীটিও একটি "সহি ইসলামী-মিথ্যা অপ-প্রচারণা"!** কুরাইশদের অত্যাচার বা মৃত্যু হুমকির কারণে নয়, **"ইসলাম রক্ষার"** প্রয়োজনেই মুহাম্মদ স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদই তার অনুসারীদের তাদের অমুসলিম পিতা-মাতা-প্রিয়জনের কাছ থেকে লোভ, হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে (জোরপূর্বক) হিজরতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ তাঁর অনুসারীদের অনেকেই তখন তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে ফিরে যাচ্ছিল। এ পরিস্থিতিকে সামাল দিতেই মুহাম্মদ হিজরতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো "হিজরত পর্বে"।

**অত:পর**

১১) মুহাম্মদ ও তার হিজরতকারী অনুসারীরা শুরু করলেন আনসার (মদিনার সাহায্যকারী) মুখাপেক্ষী নতুন জীবন। কতদিন আর অপরের মুখাপেক্ষী থাকা যায়? বেকার জীবন? জীবিকা জুটবে কোথা থেকে? "সেই" সৃষ্টিকর্তাটি যদি অলৌকিক উপায়ে মুহাম্মদ ও তার মক্কাবাসী হিজরতকারী অনুসারীদের (মুহাজের) খাদ্য-পরিধেয়-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে তো কোনো চিন্তাই ছিল না! তা যখন নেই, অর্থ উপার্জনের একটা পথ তো বের করতেই হবে! উপায়? হিজরতের **মাস সাতেক** পরেই জীবিকার প্রয়োজনে মুহাম্মদ শুরু করলেন নতুন অভিযান। **রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর হামলা (ডাকাতি), যুদ্ধ-খুনাখুনি আর জোরপূর্বক অপরের জান-মাল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ!** সর্বপ্রথম মুহাম্মদ যে হামলাকারী

দলটি পাঠান, তা ছিল তার চাচা হামজার নেতৃত্বে। সিফ-আলবদর (মার্চ, ৬২৩)। [1][2][3]

১২) **মক্কার ১৩ বছরের চরম ব্যর্থতার পর** **মদিনায় পরবর্তী ১০ বছর** (৬২২-৬৩২) অন্যের সম্পত্তি লুট ও গণিমতের মালের ভাগে জীবিকা-বৃত্তি! রক্তের হোলী-খেলা ও নৃশংসতার বিনিময়ে অর্জিত সফলতা! দশ হাজারেরও অধিক অনুসারীদের নিয়ে 'মক্কা আক্রমণ' ও বিজয়।

১৩) তারপর ১৩৫০ কোটি বছরের গচ্ছিত সে সকল বাণী পৃথিবীতে আগমনের **মাত্র ২২-২৩ বছরের মাথায়** সৃষ্টিকর্তা তাঁকে মৃত্যুর পথযাত্রী করলেন (জুন, ৬৩২)!

১৪) মৃত্যুর আগে মুহাম্মাদ তার অনুসারীদের আদেশ দিলেন, তারা যেন **পৌত্তলিকদের আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত** করে। (সহি বুখারী: ভলিউম-৫, বই-৫৯, নং-৭১৬) [4]

**Narrated Ibn Abbas:**

(অংশ বিশেষ) ---The Prophet said, "Leave me, for my present state is better than what you call me for." Then he ordered them to **do three things.** He said, "Turn the pagans out of the 'Arabian Peninsula; respect and give gifts to the foreign delegations as you have seen me dealing with them." (Said bin Jubair, the sub-narrator said that Ibn Abbas kept quiet as rewards the third order, or he said, "I forgot it.") (See Hadith No. 116 Vol. 1)

## তারপর

১৫) মুহাম্মদের নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের মাধ্যমে **সেই সৃষ্টিকর্তার** রচিত সর্বকালের সকল মানুষের **"একমাত্র জীবনবিধান"** প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা! গত ১৪০০ বছরে **২৭০ মিলিয়ন কাফের** ও অজ্ঞাত পরিমাণ মুসলমান (নিজেদের মধ্যে খুনা-খুনি করে) নিধনের বিনিময়ে অর্জন পৃথিবীর মাত্র **২৪ শতাংশ লোককে ইসলামের পতাকাতলে সামিল!** ১৪০০ বছরেও মুহাম্মদের "সেই" সৃষ্টিকর্তা তার ফেরেশতা ও অনুসারী মানবকুলের সক্রিয় সাহায্য নিয়েও পৃথিবীর ৭৬ শতাংশ লোককে তার দলে সামিল করতে পারেনি! **বিফলতার এ এক চূড়ান্ত রূপ!** এই সৃষ্টিকর্তাকেই মুহাম্মদ **সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ** নামে আখ্যায়িত করেছেন।

যে কথা মানতেই হবে তা হলো, এই সুবিশাল চমকপ্রদ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন, আর যদি সেই স্রষ্টা মানুষের জন্য কোনো বার্তা বা বাণী পাঠান, তবে সেই বার্তায় কোনোরূপ অসামঞ্জস্য বা উদ্ভট-অবৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য কখনোই থাকতে পারে না। কোনোক্রমেই কোনোরূপ অযৌক্তিকতা, ভুল বা অসামঞ্জস্যতা থাকতে পারে না। শুধু **"একটি মাত্র"**ভুল, অবাস্তবতা অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই ১০০% সুনিশ্চিতভাবেই বলা যাবে যে এটা **'বিশ্বস্রষ্টার বাণী'**হতে পারে না। কারণ "স্রষ্টা" কোনো ভুল করতে পারেন না। কুরান যে 'বিশ্বস্রষ্টার বাণী' এই দাবী মুহাম্মদের। তাঁর অনুসারীরা "তাঁর বিশ্বাসে" বিশ্বাসী মাত্র। মুহাম্মদ তার **দাবীর সপক্ষে আরও ঘোষণা** দিয়েছেন:

৪:৮২- **এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত**

গত তেরোটি পর্বের আলোচনায় **"এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য"**আমরা নিশ্চিতরূপেই প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং, সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরান বিশ্বস্রষ্টার (যদি থাকেন) বাণী নয়! যে কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই জানেন যে **বিশ্বস্রষ্টা (যদি থাকেন) কোনো কিছুই কুরানে ইরশাদ করেন নাই।** ইরশাদ করেছেন মুহাম্মদ। তারপর দাবী করেছেন যে, যা তিনি বলেছেন, তা আসলে তিনি বলেননি। যেমন করে অনেক পীর-ফকির-কামেল- গুরু-বাবাজী জাতীয় লোকেরা দাবী করে যে, তাদের শরীরে জ্বিন, আত্মা বা অশরীরী শক্তির ভর হয়! ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় তারা যা বলে, তা আসলে তাদের কথা নয়! দাবী করে যে, তাদের সে কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের শরীরে ভর করা অশরীরী শক্তির! তেমনি মুহাম্মদও দাবী করেছেন যে, কুরানের বাণী তাঁর নয়।

ঐ সব পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের সাথে মুহাম্মদের বিশেষ পার্থক্য এই যে তাঁদের তুলনায় মুহাম্মদ অনেক অনেক **“বেশী সফল"!** ঐসব পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের অনুসারীর সংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই নগণ্য। আর মুহাম্মদের অনুসারীদের সংখ্যা পৃথিবীব্যাপী। ১৬০ কোটি! তাদের শরীরে ভর হয় জ্বিন, আত্মা, অশরীরী শক্তি বা দেবতা। আর মুহাম্মদের শরীরে ভর হয় স্বয়ং স্রষ্টার দূত জিবরাইল! সমাজের বহু লোক এ সকল **কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের** বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। তাদেরকে অনুসরণ করেন, সমীহ করেন! কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তার কোনো মানুষই এ সকল তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের আর বিশ্বাস করেন না। তাদের জারিজুরি যে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ ব্যাপারে বিজ্ঞান আজ নিশ্চিত। এসমস্ত মানুষদের ঠক-প্রতারক ও অন্ধবিশ্বাস ব্যবসায়ী রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

আজকের কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীরা যে কারণে অশরীরী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন, মুহাম্মদও সেই একই কারণে জিবরাইল নামক অশরীরী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব

করেছিলেন। **কী সে কারণ?** কারণটি হলো **"গুরুর প্রয়োজন"!** ভক্তকে প্রভাবিত করার প্রয়োজন! নিবেদিত ভক্তকুলকে গুরুর ইচ্ছামত চালিত করার প্রয়োজন। ভক্তের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের প্রয়োজন! মুহাম্মদের উদ্ধৃত এহেন দুর্বল, অবিবেচক, পক্ষপাতদুষ্ট, নৃশংস, নীতি-হীন সৃষ্টিকর্তাটি আর যে-ই হোন, মহাবিশ্বের স্রষ্টা নন! **মুহাম্মদ তাঁর প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসাবেই "আল্লাহকে সৃষ্টি করেছিলেন"!** এ সত্যকে ইসলাম বিশ্বাসীরা যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে পারবেন, তত দ্রুতই তাদের মুক্তি মিলবে।

ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছে স্বভাবতই এ সত্যটি গ্রহণ করা সহজ নয়। কারণ, **শিশুকালের অনুশাসন** (childhood Indoctrination) এবং পরিপার্শ্বিক সমাজ ও সংস্কারের সর্বদা ক্রিয়াশীল অবিরাম **মগজ ধোলাই**-এব প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর প্রভাব থেকে মুক্তি সহজ নয়! Freedom Is Not Free!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

**তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:**

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** translated by M.V McDonald, Annotated by W. Montgomery Watt, [State

university of New York press (SUNY), Albany, @1987, New-York, ISBN 0-88706-345-4 (pbk); পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৬৫

http://books.google.com/books?id=ctvk-fdtklYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[2] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1; পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৫

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ১, পৃষ্ঠা ৯

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৬-৭

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৭১৬**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5196-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-716.html

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৫: কুরানের ফজিলত!

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে বিশ্বাস ও মান্য করে তাঁর বাণীকে (কুরান) অনুসরণের ফজিলত (উপকারিতা) বহুবিধ! অল্প কিছু উদাহরণ:

২:২- এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। **পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য**

১৬:৬৪- আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং **ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে।**

১৮:২- একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে-তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, **তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।**

>>> অর্থাৎ, যারা মুহাম্মদকে (আল্লাহ) বিশ্বাস করে তার হুকুম তামিল করবে, শুধু তারাই হবে, "(সত্য) পথ-প্রাপ্ত, ক্ষমা-প্রাপ্ত, উত্তম প্রতিদান-প্রাপ্ত এবং রহমত-প্রাপ্ত (১৭:৮২)"; কিন্তু যারা মুহাম্মদ ও তার কথাকে বিশ্বাস করবে না, তার কথামত চলবে

না, তাদের কী হবে? তাদের জন্য শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি! তাদের ক্ষতি বাড়তেই থাকবে!

**মুহাম্মদের ভাষায়:**

১৭:৮২- আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। **গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।**

১৭:৮২ এর **"গোনাহগার"** শব্দটি দেখে বিভ্রান্ত হবার কোনো অবকাশ **নেই। ইসলামের প্রাথমিক শর্ত হলো "ইমান";** মুহাম্মদের (আল্লাহর) প্রতি বিশ্বাস। **এই শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদকে (আল্লাহ) অবিশ্বাসকারী প্রতিটি মানুষই গোনাহগার।** একই ভাবে ইসলামে বর্ণিত **"সৎকাজ"** শব্দটি নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়! এখানেও ইসলামের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ (আল্লাহ) যে কাজের আদেশ করেছেন, সেই কাজটিই হলো "সৎকাজ।" হোক না সেটা মানুষ খুন, লুটের মাল ভোগ (গনিমত), দাস-দাসীকরণ বা দাসী সম্ভোগ! যে কাজটি তিনি নিষেধ করেছেন তা **"অসৎ-কাজ"।** Straight and Simple!

২০১০ সালের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যা ৬৯০ কোটি। মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক ১৬০ কোটি। আর অমুসলিমদের পরিমাণ আনুমানিক ৫৩০ কোটি। অর্থাৎ, বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার সিংহভাগই (৭৬ শতাংশ) অমুসলিম। ২০১০ সালের সমীক্ষায় আরও দেখানো হয়েছে যে, অমুসলিমদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অতীতে আরও অনেক বেশী ছিল। ১৯৯০ সালে তা ছিল ৮০ শতাংশ। অমুসলিমরা কুরানকে সৃষ্টিকর্তার বাণী এবং মুহাম্মদকে সেই স্রষ্টার প্রেরিত বিশেষ মহামানব (নবী) হিসাবে কখনোই স্বীকার করেন না। তাই প্রবক্তা মুহাম্মদের ওপরোক্ত ১৭:৮২ দাবি মুতাবেক **কুরানের বাণী এবং তার শিক্ষা সর্বদায় পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে এসেছে,** সেই শুরু থেকে!

দাবি করা হয় যে, সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা জীব হলো **মানব জাতি!** "আশরাফুল মখলুকাত"! যে সৃষ্টির আগমনের জন্য স্রষ্টা ১৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষায় ছিলেন! এই অত্যন্ত সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর সেই বিশেষ সৃষ্টির মধ্য থেকে স্রষ্টা আরবের মরু-প্রান্তরে একেশ্বরবাদী নবীদের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে সৃষ্টি করেন! তাঁর মারফত স্রষ্টা সর্বকালের সকল মানুষের পথ প্রদর্শনকারী (হেদায়েত) যে **একমাত্র জীবন বিধানটি পাঠালেন,** তা নাযিলের শুরু থেকে গত ১৪০০ বছর ব্যাপী পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে চলেছে! কী উদ্ভট দাবী! বিশ্বাসী পাঠকদের আমি বিভ্রান্ত না হবার অনুরোধ করছি। ওপরোক্ত দাবি স্বঘোষিত নবী মুহাম্মদের (আল্লাহ)! সৃষ্টিকর্তার সাথে মুহাম্মদের এ দাবির যে কোনই সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না, তা যে কোনো স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সহজেই অনুধাবন করতে পারেন! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাকে (যদি থাকে) এতটা অবিবেচক ভাবার কোনোই কারণ নেই। মুহাম্মদ তার দলকে ভারী করার জন্য সৃষ্টিকর্তার নামে কত যে **প্রলাপ** বকেছেন তার নমুনা ইতিহাস হয়ে আছে কুরানের পাতায় পাতায়! পৃথিবীর কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তা সে মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ যে-ই হোন না কেন। সুতরাং যুক্তি-তথ্য-বাস্তবতা ও জ্ঞানের কষ্টি-পাথরে অনুত্তীর্ণ তাদের যে কোনো একজন বা সবার দাবিকে নির্দ্বিধায় বাতিল করেও মানুষ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হতে পারেন। **বিশ্বাস কোনো প্রমাণ নয়।** এটা বিশ্বাসীর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি। তার সেই অপ্রমাণিত বিশ্বাসকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তার নেই।

**প্রবক্তা মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন:**

১৬:১০২- বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, **যাতে মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন** এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথ নির্দেশ ও সু-সংবাদ স্বরূপ।

**>>> মুহাম্মদের এই দাবিটির মধ্যে আদৌ কি কোনো সত্যতা আছে?** বাস্তবতা কী বলে? অমুসলিমরাই আজ বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুমিনরা নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অমুসলিমরাই আজ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আজকের বিশ্বে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা-মর্যাদায় **ইসলাম অনুসারীরাই পৃথিবীর সর্বনিম্ন, যা মুহাম্মদের ওপরোক্ত ১৬:১০২ দাবীর পরিপন্থী।** মুসলমানেরা যত তাড়াতাড়ি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তত দ্রুত তাদের মুক্তি মিলবে! কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মুসলমানই এই সত্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, স্বীকার করতেও রাজি নয়! অনেকে এটাও বলেন যে, মুসলমানদের আসল সাফল্য হলো মৃত্যুর পর বেহেশতে প্রবেশ। তাই তারা সর্বদাই সাফল্যমণ্ডিত। আর অমুসলিম কাফেররা সর্বদাই অসফল! কারণ তারা কখনই বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। মৃত্যুর ওপার থেকে কেউ সংবাদও পাঠাতে পারে না। তার পরেও এ সকল মুসলমান নিশ্চিত! ক্যামনে? কারণ তা কুরানেই লেখা আছে। কুরানের কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কী? কারণ **মুহাম্মদ বলেছেন** **কুরান বিশ্বস্রষ্টার (আল্লাহ) বাণী।** মুহাম্মদ যে মিথ্যা বলেননি, তার কী প্রমাণ? প্রমাণ, **মুহাম্মদ বলেছেন** (কুরানে), **"মুহাম্মদ সত্যবাদী।"** বক্তা নিজেই নিজের **প্রশংসাপত্র** বিলিয়েছেন! কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তির **নিজের দেয়া সনদপত্র** তার সত্যবাদিতার মাপকাঠি হতে পারে না। এই সহজ সত্যটি ধর্মান্ধরা যখন বুঝতে পারেন না, তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না!

আমি আমার চারপাশের বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনা কালে যখন জানতে চাই যে, হাজার বছরেরও বেশি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কেন মুসলমানরা আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিমদের তুলনায় পশ্চাৎপদ। প্রায় সবাই যে জবাবটি দেন, তা হলো, **"মুসলিম শাসকরা** তাদের ক্ষমতার জন্য সবকিছু

করেছেন। ইসলামের জন্য কিছুই করেননি। তাই আজকের এই দুরবস্থা!" দাবি করেন, "যদি তাঁরা **সঠিক ইসলাম** পালন করতেন, তবে মুসলমানেরাই হতো বিশ্বে সর্ব উন্নত জাতি!" তাঁরা ইসলামের শিক্ষার কোনোই দোষ দেখতে পান না! যখন তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই, মুসলিম শাসক ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ-লক্ষ মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। সেই আদিকাল থেকে ইদানীং কালের সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলমান শাসক এখনও তা করে চলেছেন আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যত্র পরম একাগ্রতায়। কিন্তু তারা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন বা অনুদান দিয়ে সাহায্য বা উৎসাহিত করেছেন, এমন নজির আমার জানা নেই। থাকলেও তাকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। শত শত বছর যাবত আমাদের পূর্বপুরুষরা সে সব মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা থেকে ইসলামিক জ্ঞান আহরণ করেছেন। পালন করেছেন তা নিষ্ঠা ভরে। আজকের মুসলমানেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই কুরান! সেই হাদিস! সেই সিরাতের (মুহাম্মদের জীবনী) শিক্ষা!

'বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'-এ দুর্বল (Da'if) হাদিসটি বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের মুখে মুখে! 'নবীর চলার পথে যে ইহুদি বুড়ি কাঁটা দিতো / আবর্জনা ফেলতো, সে পথ একদিন কাঁটা-হীন /আবর্জনা-মুক্ত দেখে নবী সেই বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন যে সে অসুস্থ; তখন নবী সেই বুড়ির সেবা-যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুললেন' - **এ সকল মহান গল্প** শোনেননি, এমন মুসলমান পৃথিবীতে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ! কিন্তু ক'জন মুসলমান জানেন যে, এ মহান গল্পের আদৌ কোনো আদি ভিত্তি নেই! ক'জন মুসলমান জানেন যে, এই কিচ্ছা ইসলামী সহি মিথ্যাচারের ফসল, **জাল হাদিস!** এমনতর ভিত্তিহীন ও জাল গল্পের উদ্ভাবক ও প্রচারক কারা? নিশ্চয়ই ইহুদী-নাসারারা নয়! নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী সৈনিকরাই যুগে যুগে পরিকল্পিতভাবে সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ মিথ্যাচার করে আসছেন! মিথ্যার বেসাতী

এ নির্লজ্জ প্রচার ও প্রসারে তারা এতটাই সিদ্ধহস্ত যে, **এ সমস্ত দুর্বল/জাল হাদিস** (Fabricated Hadits) এখন বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের মুখে মুখে।

কিন্তু সাধারণ মুসলমানেরা জানেন না, মুহাম্মদের আদেশে বনি-কুরাইজা, আবু-রাফি, ক্বাব বিন আশরাফ কিংবা আসমা বিনতে মারওয়ান সহ অসংখ্য অমানবিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা সম্বলিত সিরাত (নবী জীবনী) ও **সহি হাদিসের** সামান্যতম আভাস! আদি উৎসে এ ঘটনাগুলোর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত! সাধারণ মুসলমানেরা আরও জানেন না, অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে কুরানে বর্ণিত মুহাম্মদের অসংখ্য অমানবিক আদেশ ও নিষেধ। তাদের জানানো হয় না! পরিকল্পিত ভাবে তা গোপন করা হয়! কিংবা বৈধতা দেয়া হয় বিভিন্ন উদ্ভট কসরতের মাধ্যমে। সেই আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত **মুসলিম শাসক-যাজক চক্র** সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জনের জন্য যা কিছু করেছেন এবং করছেন তার উদ্দেশ্য ইসলামের প্রচার ও প্রসার। সুতরাং তারা ইসলামের জন্য কিছুই করেননি, এ তথ্য **ডাহা মিথ্যা।**

যখন আমি উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুদের একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন করি, "শুধু কুরান-হাদিসের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং পুরোপুরি সহি ইসলামের আদেশ ও অনুশাসন (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, বছরে ৩০ টি রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) একান্ত একাগ্রতায় পালন করে কীভাবে একজন মুসলমান ডাক্তার-প্রকৌশলী-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হতে পারেন?" জবাব আসে, "ইসলাম তো আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ নিষেধ করে নাই।" উৎসাহিত কি করেছে? সমগ্র কুরানে অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ, অসম্মান, হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন ও হত্যার উৎসাহ দিয়ে শত শত স্পষ্ট আয়াত আছে। কিন্তু **আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার আবেদন কিংবা উৎসাহ দিয়ে সমগ্র কুরানে স্পষ্ট একটি বাক্যও নাই।** সুতরাং ইসলামী শিক্ষার আদর্শের অনুসারী একজন নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় কেন আগ্রহী হবেন? তারা আগ্রহী এবং উদ্বুদ্ধ হবেন কুরান-হাদিস যে বিষয়টিকে বেশী

গুরুত্ব দিয়েছে, তার প্রতি। বাস্তবে হয়েছেও তাই। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার কোনো দোষ নেই, সব দোষ মানুষের; এ দাবিটি যাঁরা করেন, তাঁরা মূলত: মসজিদ-মৌলভী-হিপোক্রাইট চক্রের প্রোপাগান্ডার শিকার। গত ১৪০০ বছর ধরে ইসলাম বিশ্বাসীদেরকে এটাই বারংবার বোঝানো হয়েছে যে, দোষ ইসলামের নয়। **দোষ "শুধু ইসলাম" ছাড়া আর সবখানেই!** ইসলাম সর্বদাই শুদ্ধ! Islam is always right. ইসলামকে সর্বদাই আড়াল করে রাখা হয়েছে **মিথ্যার বেড়াজালে।**

**এর পরেও** যদি ধরে নিই বাস্তবতার নিরিখে (ইসলামের কোনো কৃতিত্ব নয়) নিবেদিতপ্রাণ কোনো মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় উৎসাহিত হয়ে কোনো আবিষ্কারে (উদাহরণ) ব্রতী হলেন। তিনি তাঁর সমস্ত ধ্যান-মন-প্রাণ সেই আবিষ্কারের পিছনে নিয়োগ করলেন। সময় সর্বদাই সবার জন্য ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত্রি। একজন মানুষের দেহ-মন সুস্থির রাখার জন্য প্রতিদিনে কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। আর প্রতিদিনে আরও কমপক্ষে দুই ঘণ্টা দরকার জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কাজে (প্রাতঃক্রিয়াদি, খাওয়া, গোসল, ব্রাশ ইত্যাদি) অর্থাৎ নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাই প্রতি দিন **সর্বোচ্চ ১৬ ঘণ্টা** সময় পাবেন তাদের ব্যবহারিক কাজে (উদাহরণ-এ ক্ষেত্রে আবিষ্কার)।

নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীকে তার সবচেয়ে প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, প্রতি বছরে এক মাস রোজা এবং তার সাথে আরও আনুষঙ্গিক অনুশাসন (তারাবী নামাজ, ইফতার, ইত্যাদি) পালন করতে হবে। তবেই না তাঁকে বলা যাবে সত্যিকারের ইসলাম অনুসারী! প্রতি ওয়াক্ত নামাজে গড়ে কমপক্ষে যদি সে ৩০ মিনিট সময়ও ব্যয় করেন, তবে প্রতিদিনে শুধুমাত্র নামাজের জন্যই তাঁকে আরও **অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা** সময় ব্যয় করতে হবে। ভুললে চলবে না যে, তাঁকে তাঁর সফলতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য অনুরূপ

নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি বর্গের সাথে। যাঁদের ৭৬ শতাংশই অমুসলিম। যাঁরা তাদের ১৬ ঘণ্টা লভ্য সময়ের আরও অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা 'নামাজে' ব্যয় করেন না। এ পরিস্থিতিতে অমুসলিম নিবেদিতপ্রাণ কোনো ব্যক্তির মেধা-মনন-একাগ্রতা-নিষ্ঠা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় (Variable) যদি বিশ্বাসী নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিটির সমানও হয়, তথাপি ঐ অমুসলিম ব্যক্তিটি তার ব্যবহারিক কাজে মুসলিম ব্যক্তিটির চেয়ে 'শুধু নামাজের জন্যই' প্রতি দিন অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা বেশি সময়-সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ, অমুসলিমরা মুসলিমদের চেয়ে **১৬ শতাংশ অতিরিক্ত সময় সুবিধা** তাঁর কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এমতাবস্থায় ফলাফলে কে বিজয়ী হবেন, তা যে কোনো চিন্তাশীল মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন। সুতরাং যাঁরা দাবি করেন যে, মুসলিমদের আজকের দুর্গতির কারণ ইসলামের অনুশাসন ঠিক মত পালন না করা, তাঁরা মতিবিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। বাস্তবতাবিবর্জিত 'কল্পনার' জগতে তাদের বাস। **সত্য হলো মুসলমানদের আজকের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলোর অন্যতম হলো ইসলামের শিক্ষা।** যাকে সর্বদাই বাতিল করা হয় আদি কারণ (Primary reason) থেকে। ইসলামের বাধ্যতামূলক প্রাত্যহিক ধর্মীয় অনুশাসন পূর্ণভাবে পালন করে একজন মুসলমানের পক্ষে একজন অমুসলিমের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

২০০৬ সালে ডাঃ ফারুক সেলিম এক নিবন্ধে মুসলিম ও অমুসলিম দেশের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। নিবন্ধটি একটু পুরানো হলেও গত ছয় বছরে মুসলিম জাহানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ডাঃ ফারুক তাঁর সেই নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ৫৭ টি মুসলিম দেশের মিলিত সর্বমোট জিডিপি দুই ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। যেখানে আমেরিকা একাই ১২ ট্রিলিয়ন, চায়না ৮ ট্রিলিয়ন, জাপান ৩.৮ ট্রিলিয়ন, জার্মানি ২.৪ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার (purchasing power parity basis)। প্রায় অর্ধেক আরব মহিলা

অক্ষরজ্ঞানহীন। ৫৭ টি মুসলিম দেশের ১৬০ কোটি জনগণের জন্য ৬০০ টির ও কম বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে ভারতে আছে ৮৪০৭ টি এবং আমেরিকায় ৫৭৫৮ টি । ১৬০ কোটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে গত ১১০ বছরে মাত্র ১০ জন মুসলমান নোবেল বিজয়ীর তালিকায় (২০১১ সাল পর্যন্ত) স্থান পেয়েছেন। এই দশ জনের ৬ জনই পেয়েছেন নোবেল পুরষ্কারের সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বিষয় - শান্তিতে। মাত্র দু'জন বিজ্ঞানে। ১৯৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রফেসার আবদুস সালাম (যাকে তাঁর দেশ পাকিস্তানে মুসলমান বলেই স্বীকার করা হয় না) এবং ১৯৯৯ সালে রসায়নে আহমেদ জেওয়াল। তাদের দুজনই গবেষণা চালিয়েছেন অমুসলিম দেশে। **অন্যদিকে, এক কোটি ৪০ লাখ ইহুদী জনগোষ্ঠীর ১৮৫ জন নোবেল বিজয়ী।** অর্থাৎ বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীর (মুসলমান) আহরণ মোট নোবেলের মাত্র এক শতাংশ। আর ইহুদীরা বিশ্বজনগোষ্ঠীর মাত্র ০.২৩ শতাংশ; কিন্তু তারা মোট নোবেলের ২২ শতাংশের অধিকারী। মুসলমান জনগোষ্ঠীর গড়ে প্রতি ১০ লাখে ২৩০ জন বিজ্ঞানী। যেখানে আমেরিকায় প্রতি ১০ লাখে ৪,০০০, জাপানে প্রতি ১০ লাখে ৫,০০০ জন। মুসলমান জনগোষ্ঠীর গড় শিক্ষিতের হার ৪০ শতাংশ। যেখানে খ্রিষ্টান জন গুষ্টির গড় শিক্ষিতের হার ৯০ শতাংশ। সংক্ষেপে, মুসলিম জনগোষ্ঠী আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বে সর্বনিম্ন।

আজকে **বিজ্ঞানের অবদানের** কাছে আমরা প্রতি মুহূর্তে নির্ভরশীল। অথচ বর্তমান বিশ্বে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় এমন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও নেই, যার মুখ্য আবিষ্কর্তা একজন মুসলমান। পাঠক, আপনার চারপাশে একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! বেডরুম-রান্নাঘর থকে শুরু করে স্থলে, জলে ও আকাশে! বিদ্যুৎ, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, ভিসিপি, ভিসিআর, কম্পিউটার-প্রিন্টার-স্ক্যানার, ইন্টারনেট, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, রাইস-কুকার, মটর সাইকেল, গাড়ী, রেলগাড়ি, ট্রাক-বাস-মিনিবাস, লঞ্চ-স্টিমার, উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট যন্ত্র, GPS,

চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় সামগ্রী (স্টেথোস্কোপ, এক্স-রে মেশিন, CT Scan, MRI ইত্যাদি), জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, ক্যামেরা, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি - এমন কিছু কি আপনি দেখতে পান, যার মূল আবিষ্কর্তা হলেন একজন মুসলমান? **এটি যে একটি অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থান, এ বোধও অধিকাংশ ইসলাম বিশ্বাসীর আছে বলে পরিলক্ষিত হয় না!** অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের এ বোধ না থাকলে আশ্চর্য হবার কোনো হেতু নেই। কিন্তু, যখন উচ্চশিক্ষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইসলাম-বিশ্বাসীরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, আকারে-ইঙ্গিতে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে, খবরের কাগজের আর্টিকেলে ও ব্লগ-জগতে বিতর্ক-বিতণ্ডায় **দাবী করেন যে**, তারাই পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ জাতি**, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তারা মানসিক বিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। এই মানসিক বৈকল্যের কারণে তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে, তাদের কার্যকলাপ ও বাস্তবতাবিবর্জিত অন্তঃসারশূন্য **ফাঁকা বুলিকে** অমুসলিমরা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন!

এমন কি হতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা **পরিকল্পিতভাবে** ইসলাম-বিশ্বাসীদের মেধা-মনন ও উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? অসম্ভব প্রস্তাবনা! অবশ্যই না! একজন ইসলাম বিশ্বাসীর গড় মেধা অমুসলিমদের সমতুল্য। একই পৃথিবীর পানি-হাওয়া-বাতাস ও অন্ন-বস্ত্রে মুসলিম এবং অমুসলিমরা বেড়ে উঠছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। অমুসলিমরা কোনো ভিনগ্রহ থেকে আবির্ভূত হয়নি! যে সমস্ত মুসলমান ভাই তাদের অনুন্নত জন্ম-ভূমি ছেড়ে ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-জাপান-নিউজিল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন **উন্নত** (Developed) কাফেরের দেশে ভাগ্য উন্নয়নে পাড়ি দিয়েছেন, তাদের পরিমান মোট বিশ্ব-মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় তিন শতাংশ (৫ কোটি); এ ছাড়াও মোট মুসলিম জনসংখ্যার **২৩.৩ শতাংশেরও বেশী মুসলমানদের নিবাস উন্নয়নশীল (Developing) অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে।** অর্থাৎ মোট মুসলিম জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি বসবাস করছেন এবং বেড়ে উঠছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম দেশগুলোর নাগরিকদের সাথে। একই কাতারে। একই পানি-হাওয়া-বাতাস

ও সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়ে। **তথাপি,** বিশ্ব জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধিত্বকারীর পক্ষ থেকে যখন একটি আবিষ্কারও বর্তমান বিশ্বের আপামর জনসাধারণের উপকারার্থে দেখা যায় না, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা-ভাবাদর্শে একটি **মৌলিক গলদ** আছে! কী সে গলদ?

মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের একটি মৌলিক ও সাধারণ পার্থক্য হলো - **ধর্ম। আর সকল ধর্মেরই এক বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, একান্ত শিশু-অবস্থার কোমল মস্তিষ্কে "ধর্ম-বীজ" রোপণ করা!** ধর্মের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, শাসন-অনুশাসন, ভাল-মন্দ ইত্যাদি যাবতীয় বোধ শিশু মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া! এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। জীবনের পরবর্তী সময়ে চিন্তা-ভাবনা-মন-মানসিকতায় এর প্রভাব নিশ্চিতরূপেই পরিলক্ষিত হয়। তাই একজন মুসলমানের মেধার সাথে একজন অমুসলমানের মেধার তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও তাদের চিন্তা-ভাবনা-চেতনা-মন-মানসিকতার পার্থক্য অনেক! মুসলমানদের অবক্ষয়ের পেছনে **ধর্মশিক্ষার** কোনো যোগ নেই, এ ধারনা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত! সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মুহাম্মদের বাণী (কুরান-হাদিস) ও শিক্ষা গত ১৪০০ বছর ধরে শুধু অবিশ্বাসীদেরই নয় (১৭:৮২); বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষেরই শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে চলেছে! পরিসংখনে এ সত্যও স্পষ্ট যে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা মুহাম্মদের বাণী ও শিক্ষায় আস্থাবান।

**কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী-মনীষীর অবদান তাঁর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়!** শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য এ সকল বিজ্ঞানী-মনীষী-বুদ্ধিজীবীদের অর্জন তাঁদের জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। ধর্মের কোনো কৃতিত্বই এখানে নেই। উদাহরণ, আলবার্ট আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে ইহুদী ধর্মের কোনো কৃতিত্ব নেই। কোপারনিকাস, ব্রুনো, গালিলিও, নিউটন অথবা চার্লস ডারউইনের

যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজীর আবিষ্কারের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। এ সকল বিজ্ঞানী/মনীষীদের অনেকেই বিশ্বাসীদের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, যখন তাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বা বিবৃতি ছিল প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীতে। আজও তা অব্যাহত আছে বহাল তবিয়তে! তথাপি বিশ্বাসীরা এ সকল বরেণ্য মনীষীদের নাম ব্যবহার করে তাদের **ধর্মের মহাত্ব** প্রচারে পিছপা হন না। ইসলাম বিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার! তাঁরা কারণে-অকারণে মধ্যযুগের আরব-পারস্যের মুসলিম বিজ্ঞানী/মনীষীদের উদাহরণ টেনে **ইসলামের স্বর্ণযুগ**-এর মহাত্ব বয়ান করেন। এ সকল মুসলিম মনীষীদের আবিষ্কারের পিছনে "ইসলামের" কোনোই ভূমিকা নেই।

**পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের সাধারণ ধর্মাম্বলীরা ইসলামের মত এত বেশি সময়সাপেক্ষ অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট নয়।** একজন নিবেদিত প্রাণ সাধারণ মুসলমান তা'র প্রাত্যহিক ১৬ ঘণ্টা লভ্য সময়ের ২-৩ ঘন্টা ব্যয় করেন শুধুমাত্র **নামাজেই।** এ ছাড়াও আছে অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় আরও অন্যান্য অনুশাসন। প্রত্যুষে ঘুম ঠেকে ওঠার সময় থেকে (ফজর নামাজ) শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত (এশার নামাজ) প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে ৫ বার ইসলাম বিশ্বাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদের গুণকীর্তন-আদেশ নিষেধের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় উচ্চকণ্ঠ আজানের মাধ্যমে। পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে। পরিপার্শ্বের অন্যান্য মুসলমানদের মাধ্যমে। ১৬ ঘণ্টায় ৫ বার! অর্থাৎ, গড়ে **প্রতি ৩ ঘণ্টায় একবার!** জন্ম থকে মৃত্যু পর্যন্ত! সুস্থ চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার সময় কোথায়? ফলশ্রুতিতে ইসলাম বিশ্বাসীদের ধ্যান-মন-প্রাণের সবটা জুড়েই থাকে মুহাম্মদের বাণী (কুরান-হাদিসের) ও অনুশাসন চিন্তা! মুহাম্মদ (আল্লাহ), মুহাম্মদ আর মুহাম্মদ! ফলে তাঁদের মগজ ধোলাই অন্যান্য ধর্মের মানুষের তুলনায় হয় **অধিকতর নিশ্চিত (Guaranteed), তীব্রতর ও**

**সুদূরপ্রসারী!** মুক্তচিন্তার পথ চিরতরে হয় রুদ্ধ! মুহাম্মদের জালে তাঁরা হয়ে পড়েন আষ্টেপৃষ্টে বন্দী! তাঁদের চেতন-অবচেতন মস্তিষ্কের সবটা জুড়েই বাসা বাঁধে বেহেস্তের প্রলোভন ও দোযখের অসীম শাস্তির ভয় এবং কবর আযাবের বিভীষিকাময় চিত্র! তিনি মুক্ত মানুষ থেকে পরিণত হন দাসে! পরম তৃপ্তিতে! **একান্ত আজ্ঞাবহ মুহাম্মদের দাস! আবদ-মুহাম্মদ!**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৬: কুরানের অ্যানাটমি

## কুরান কী?

কুরান হচ্ছে মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-Biography)। কুরানের বহু ঘটনা বিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের জীবনেরই অংশ বিশেষ। তাঁর নবী-জীবনের সংঘাতময় ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপার্শ্বিক মানুষের সাথে তাঁর আচরণের বর্ণনা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। চারণ-কবির মত তা তিনি প্রচার করেছিলেন 'আল্লাহর বাণী' বলে। যেহেতু কুরানের বহু ঘটনাবিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের জীবনেরই অংশ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন; সেহেতু মুহাম্মদের কর্মজীবন ও তাঁর পারিপার্শ্বিকতার সঠিক ইতিহাস জানতে এ বইটি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের (Psycho-Biography) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যায় কুরান থেকেই। বলা হয়, যে মুহাম্মদকে জানে সে ইসলাম জানে। যে মুহাম্মদকে জানে না সে ইসলাম জানে না। ইসলামকে সহি উপায়ে বুঝতে হলে মুহাম্মদকে জানতেই হবে! এর কোনোই বিকল্প নেই।

মুহাম্মদের সেই বাণীগুলো ছিল বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন অনুসারীদের কাছে। কেউ কেউ তা লিখে রেখেছিলেন, কেউ কেউ করেছিলেন মুখস্থ। বিচ্ছিন্ন সেই বাণীগুলো মুহাম্মদের মৃত্যুর (জুন, ৬৩২) **উনিশ বছর পর** খলিফা উসমানের সময় একটি **কমিটি কর্তৃক** অত্যন্ত **বিশৃঙ্খলভাবে** সম্পাদিত হয়ে সম্পূর্ণ বই আকারে লিপিবদ্ধ হয়। সম্পাদিত সেই

কিতাবটিই হলো কুরান। যে আলী ইবনে আবু তালেব মুহম্মদের নিজস্ব পরিবারের সদস্য, যে আলী নয় বছরে বয়সে হন মুসলমান, যে আলী মুহাম্মদকে তার কবরে শোয়ানো পর্যন্ত (৫ জন লোকের একজন যারা মুহাম্মদকে কবরে শুইয়েছিলেন) সর্বদাই ছিলেন তাঁর সঙ্গী। সেই আলীকে ঐ কমিটিতে রাখা হয়নি। সম্পাদনের সময় মুহাম্মদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাকে (Chronology) কোনোরূপ আমলেই নেয়া হয় নাই। বাতিল (Abrogated) আয়াতগুলোকেও এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কোনোরূপ টিকা-মন্তব্য (foot-note) ব্যতিরেকেই। তাই এ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করা বেশ দুরূহ। এতদসত্ত্বেও এ গ্রন্থে অনেক অনেক তথ্য আছে, যা থেকে মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব ও তাঁর পরিপার্শ্বিক সমাজের কিছুটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। প্রয়োজন নির্মোহ পক্ষপাতহীন অনুসন্ধান।

## কুরানের অ্যানাটমি

কুরানের মোট সুরা সংখ্যা ১১৪ টি। সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত কুরানের উৎস মোতাবেক - এর ৮৭ টি সুরা মক্কায় অবতীর্ণ। বাঁকি ২৭ টি মদিনায়। কুরানের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ টি। এর ৪৭০৪ টি মক্কায় এবং ১৫৩২ টি মদিনায়। মোট সময় কাল মক্কার ১২-১৩ বছর (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) এবং মদিনায় ১০ বছর (৬২২-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) । আয়াতের সংখ্যা ও বর্ণনায় সূত্রভেদে কিছুটা বিভিন্নতা আছে। অনেক সুরার অবতীর্ণের স্থান নিয়েও বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নতা আছে। বিশেষ করে কুরানের শেষের অংশের কিছু সুরার ক্ষেত্রে। **কুরানের সমস্ত আয়াত দুই ভাগে বিভক্ত:**

১) মক্কায় অবতীর্ণ

২) মদীনায় অবতীর্ণ

মদিনায় অবতীর্ণ ২৭ টি সুরাকে ছড়ার আকারে সহজে মনে রাখার উপায়:

**দুই থেকে নয়,**
**বাদ সাত ছয়।**
**বাইশ-চব্বিশ ও তেত্রিশ,**
**উনপঞ্চাশ-আটচল্লিশ আর সাতচল্লিশ।**
**সাতান্ন হইতে ছেষট্টি আর পাঁচ-পঞ্চাশ,**
**যিলযাল-নছর-ফালাক-আর নাসে মদিনায় সাতাশ।**

## মক্কা ও মদিনার সুরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

### ১) মক্কায় অবতীর্ণ সুরা

যাবতীয় **কসম ও শপথ,** পুরাকালের নবীদের গল্প-গাঁথা ও মোজেজার বর্ণনা, দোযখের বীভৎস বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষ হুমকি ও ভীতি-প্রদর্শন, মাঝে মধ্যে **সহনশীলতার** উপদেশ ও **আধ্যাত্মিক কথাবার্তা-** এ সমস্ত আয়াতের জন্মস্থান হলো মক্কা। তা সে কুরানের যে অংশেই থাকুক না কেন। এ বাণীগুলো মুহাম্মদ প্রচার করেছেন মক্কায় (৬১০-৬২২) । যখন তাঁর বাহুবল ও জনবলের কোনোটাই ছিল না তাঁর নিজেরই আত্মীয়, পরিবার, পরিজন ও মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার।

### ২) মদীনায় অবতীর্ণ সুরা

অমুসলিমদের প্রতি যত **কঠিন থেকে কঠিনতর** আয়াত, **প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ,** অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছেদের নির্দেশ, আইন ও বাধ্যবাধকতা (Rules and

obligations) - এ সমস্ত আয়াতের জন্মস্থান হলো মদীনা - তা কুরানের যে অংশেই থাকুক না কেন। এ আয়াতগুলো মুহাম্মদের শক্তি-বৃদ্ধি 'মাপকঠির' ধারাবাহিক বর্ণনা। মুহাম্মদের (আল্লাহর) সর্বশেষ আদেশযুক্ত বাণী সুরা তওবাহ (৯ নম্বর সুরা)।

**যদি দুই বা ততোধিক আয়াত বিপরীতধর্মী বা পরস্পরবিরোধী হয়, তবে যে আয়াতটি "পরে" নাজিল হয়েছে সেটাকেই বলবত ধরতে হবে।**

যার সরল অর্থ হল, সেরূপ ক্ষেত্রে মদীনার আয়াত (পরে নাজিলকৃত) মক্কার আয়াতগুলোকে বাতিল (Abrogate) করে। তাই বিপরীতধর্মী কোনো বিশেষ আয়াতের কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা জানতে সে **"আয়াতের জন্মস্থান**" জানা অত্যন্ত জরুরী। তা না জানলে সুবিধাবাদী ইসলামিষ্ট ও পণ্ডিতদের (তথাকথিত মডারেট) **'সুবিধাজনক কুরান-উদ্ধৃতিতে'**বিভ্রান্ত হওয়া প্রায় সুনিশ্চিত।

যে সমস্ত মৌলবাদী **জেহাদি ভাইয়েরা** আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল সর্বস্ব বাজী রেখে অপরকে মারছেন এবং নিজেও মরে তাদের বিশ্বাসের গভীরতার (Extreme devotion by ultimate sacrifice) প্রমাণ দিচ্ছেন, তাঁরা কুরানের সেই আয়াতগুলোকেই মান্য করেন, যেগুলোর জন্মস্থান হচ্ছে মদীনা। বিশেষ করে 'সুরা তওবাহর' বাণী। মুহাম্মদের (আল্লাহর) সর্বশেষ আদেশযুক্ত বাণী হল সুরা তওবাহ (৯ নম্বর সুরা) । মৌলবাদী জিহাদিরা **'একান্ত সহি ভাবে'**জানে যে, তারা সত্য পথের উপর আছে। তারা খুব ভালভাবে জানে যে, পরবর্তী সময়ে নাযিলকৃত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতকে নাকচ করে দিয়েছে। **অত্যন্ত সহজ তাদের যুক্তি:** পৃথিবীর অন্য সব আইনের মতই পরবর্তীতে জারিকৃত আইন ও নীতিমালা পূর্বের জারিকৃত আইন ও নীতিমালাকে নাকচ করে দেয়। **এই সহজ বিষয়টা তথাকথিত মডারেট মুসলমানেরা বুঝতে পারে**

**না। কারণ তারা হয় ধর্ম বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ অথবা বুঝতে চায় না কারণ তারা হিপোক্রাইট।**

**বক্তব্যের সারাংশ অনুযায়ী কুরানের আয়াতগুলোকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেনীতে ভাগ করা যায়:**

| সার বক্তব্য | আয়াত সংখ্যা (কম পক্ষে) |
|---|---|
| ১) পূর্ববর্তী নবীদের গল্পগাথার উপাখ্যান | ১২৪০ |
| ২) অবিশ্বাসীদেরকে হুমকি,শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ | ৫২১ |
| ৩) অবিশ্বাসীদেরকে হামলা, খুন ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ | ১৫১ |
| ৪) অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ, ও বিপথগামী করে হেদায়েত বঞ্চিতকরণ | ৬৬ |
| ৫) আল্লাহ যাকে খুশী হেদায়েত দেন, যাকে খুশী শাস্তি দেন | ৫০ |
| ৬) যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিতে যার কোনো অর্থ নেই | ২০৪ |
| ৭) পূর্ববর্তী নবীদের অলৌকিক মোজেজার বর্ণনা | ৬৫ |
| ৮) পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ 'মোজেজা' -প্রমাণ" দেখতে চায় কুরাইশরা: প্রতিউত্তরে মুহাম্মদের জবাব | ৯৬ |

| | |
|---|---|
| ৩২) মেয়ে শিশু হত্যা সংক্রান্ত | ৩ |
| ৩৩) প্যাগানরা ছিল "আল্লাহ" বিশ্বাসী | ১০ |
| ৩৪) অবিশ্বাসীদের যুক্তি: তারা কি নির্বোধ ছিলেন? | ৫ |
| ৩৫) কুরানে বিজ্ঞান? | ১৭১ |
| ৩৬) পৌরাণিক কাহিনী: উদাহরণ-"জ্বীন, হুদ হুদ পাখী ও বাদশাহ সোলায়মানের গল্প" | ২৮ |
| ৩৭) প্রসঙ্গ জ্বীন জাতি | ২৩ |
| ৩৮) নামাজের ওয়াক্ত সংক্রান্ত | ৭ |
| ৩৯) অন্যান্য | বাকি সব |

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, **মক্কায় মোট ৪৭০৪ টি আয়াতের কমপক্ষে ১২৪০টি পুরাকালের উপকথা** (২৬.৩ শতাংশ) । অর্থাৎ মক্কায় প্রবক্তা মুহাম্মদের প্রতি চারটি বাক্যের একটি হলো পুরাকালের নবীদের উপকথা। তার **সাথে হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন-অসম্মান এবং হামলা-খুন-সম্পর্কচ্ছেদ ও অভিশাপ আদেশ সমন্বয়ে মোট আয়াত সংখ্যা (১২৪০+৫২১+১৫১+৬৬) = ১৯৫৮ টি,** যা সমগ্র কুরানের ৩১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ **সমগ্র কুরানের প্রতি তিনটি বাক্যের একটি হুমকি-শাসানি-ত্রাস অথবা**

**পুরাকালের নবীদের গল্প সম্বলিত।** আশা করি চিন্তাশীল পাঠকদের এই তথ্যটি বিশেষ চিন্তার খোরাক যোগাবে!

কুরানের অলৌকিকত্বের দাবীদাররা তাঁদের দাবীর সপক্ষে যে **"প্রমাণ"** প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেন, তা হলো একজন অক্ষরজ্ঞানহীন লোকের পক্ষে কীভাবে এতসব লেখা সম্ভব? সত্য হচ্ছে, মুহাম্মদ কিছুই লেখেননি। তিনি বলেছেন। অন্যেরা তার "বচন" মুখস্থ করেছেন, কেউ কেউ তা লিখে রেখেছেন। এখানে যে সত্যটা প্রমাণিত, তা হলো, মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। সর্বমোট ৬২৩৬ টি বাক্য চারণ (রচনা) করা হয়েছে সুদীর্ঘ ২২- ২৩ বছরে (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ), অর্থাৎ, ৮০৩০ দিনে ৬২৩৬টি বাক্য রচনা। **প্রতি দিন গড়ে "একটির ও কম"বাক্য।** আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে:

**মক্কায়** ৪৩৮০ দিনে ৪৭০৪ টি বাক্য। অর্থাৎ, গড়ে **"প্রতিদিনে একটি" বাক্য"**।

**মদিনায়** ৩৬৫০ দিনে ১৫৩২টি বাক্য। অর্থাৎ, গড়ে **"প্রতিদিনে অর্ধেক বাক্য"**।

**যে কোনো নিবেদিতপ্রাণ মানুষই দিনে "একটি" বাক্য অনায়াসেই রচনা করতে পারেন।** মুহাম্মদ ও তাই করেছিলেন। কুরানের বহু ঘটনা বিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের জীবনেরই অংশবিশেষ। তাঁর নবী-জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিপার্শ্বিক মানুষদের সাথে তাঁর আচরণ, পৌরাণিক নবীদের গল্প ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির বর্ণনা। **এসব রচনা কোনো অলৌকিকত্বের প্রমাণ নয়।**

**প্রবক্তা মুহাম্মদ জানিয়েছেন:**

২০:১১৩- এমনিভাবে আমি নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।

খুবই সুন্দর বাণী! নির্মোহ ও মনোযোগী হয়ে বুঝে কুরান পড়ুন! চিন্তা করুন! সত্যকে জানুন!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৭: এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই!– এক

সংকলিত কুরানের প্রথম চ্যাপ্টার হল সুরা ফাতেহা। যা মূলত: প্রার্থনা বা দোয়া। বিছমিল্লাহ হির-রাহমা-নের-রাহিম এবং সুরা ফাতেহা কুরানেরই অংশ কি না, এ ব্যাপারে সাহাবীরাও একমত ছিলেন না (বুখারী-৬:৬০:২২৬-২২৭)। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ সুরা ফাতিহাকে কোরানের সুরা হিসেবে কোনোদিনই স্বীকার করেননি। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) যা বলেছেন তা হলো,

**১৫:৮৭- আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি।**

সুরা-ফাতিহার এই প্রার্থনাটির পর কুরানের সর্বপ্রথম যে বাণী তা হলো "হিং-টিং-ছট" জাতীয় শব্দ। "আলিফ-লাম-মীম"**(২:১)**। এই উদ্ভট হিং-টিং-ছট জাতীয় শব্দটির পরেই কুরানের **সর্বপ্রথম বোধগম্য** যে বাণী' তা হলো, **"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই"( ২:২)**। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার প্রকাশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে প্রবর্তকের **"অভিশাপ"(**দ্বাদশ পর্ব) আর এর ধর্মগ্রন্থটির শুরুতেই রয়েছে **'সন্দেহ'**-এর আলামত! প্রবক্তা মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, এ গ্রন্থে কোনোই সন্দেহ নেই। শুরুতেই "সন্দেহ" শব্দ থাকার কারণে পাঠকরা যা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, তা হলো প্রবক্তা মুহাম্মদ এবং তাঁর বাণীকে তাঁর পরিপার্শ্বের মানুষেরা

সন্দেহাতীত মনে করতেন না। 'নকল হইতে সাবধান' বাক্যটি যেমন নকল-বিহীন পরিবেশ ও সমাজে বেমানান, 'এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নেই' বাক্যটিও তেমনি। মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তাতে মানুষ "সন্দেহ পোষণ" করতেন। তাঁদের সেই সন্দেহের বিপরীতে **আত্মরক্ষার** খাতিরেই মুহাম্মদকে (আল্লাহ) বলতে হয়েছে এই বাক্যটি। কিন্তু সাক্ষ্যের আগে সাক্ষীর শপথ বাক্য **"যাহা বলিব সত্য বলিব এবং সত্য বই মিথ্যা বলিব না"** যেমন সাক্ষীর সত্যবাদিতার প্রমাণ নয়, পণ্যের প্যাকেটে "নকল হইতে সাবধান" সিলটি যেমন পণ্যটির নকলের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। তেমনি প্রবক্তা মুহাম্মদের "এই সেই কেতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নাই" বাক্যটিও মুহাম্মদের (আল্লাহ) উক্তির সত্যতার প্রমাণ নয়। সত্য-মিথ্যা নির্ধারনের জন্য প্রয়োজন **প্রমাণ, যুক্তি ও তথ্য বিচার।** একই ভাবে পণ্য আসল না নকল, তা নির্ধারণ হয় **গুণগত** মানের বিচারে। মুহাম্মদের পরিপার্শ্বের মানুষ (অবিশ্বাসীরা) মুহাম্মদের দাবীকে যেভাবে মূল্যায়ন করতেন, তা ছিল মূলতঃ নিম্নরূপ:

**১) পূর্ববর্তীদের উপকথা**
**২) মুহাম্মদ নিজে কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্যে করেছে**
**৩) মুহাম্মদ প্রেরিত ব্যক্তি নন, সে মিথ্যাবাদী, উন্মাদ/যাদুগ্রস্থ**

পাঠক, আসুন আমরা নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে **মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর** আলোকে অবিশ্বাসীদের এ সকল দাবীর কারণ এবং তার যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণের চেষ্টা করি। সত্যকে জানার চেষ্টা করি।

## প্রথম অভিযোগ: পূর্ববর্তীদের উপকথা

প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন যে, অবিশ্বাসীরা তাঁর দাবীকে নাকচ করতেন এই অভিযোগে যে, তিনি যা প্রচার করছেন, তা **"সেকালের উপকথা মাত্র"**। তাঁদের কাছে তা নতুন কোনো খবর নয়। তাঁরা এ সকল কিচ্ছা-কাহিনী শুনে এসেছেন বংশ পরম্পরায়!

**মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,**

৬:২৫- তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে| আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি| যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না| এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে: **এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী বই তো নয়।**

২৭:৬৮- 'এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। **এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়।**

৪৬:১৭- তখন সে বলে, **এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়।**

৬৮:১৫- তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে; **সেকালের উপকথা।**

৮৩:১৩- তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, **পুরাকালের উপকথা**

>>> প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের (আল্লাহ) কথাগুলোকে বলতেন "এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা/পুরাকালের উপকথা"? অবিশ্বাসীদের এ অভিযোগের ভিত্তি কী? শত্রুতা? নাকি অন্য কোনো কারণ? **একটা গল্প শোনা যাক:**

## পিপীলিকা, জনৈক দৈত্য ও  হুদ-হুদ পাখীর গল্প:

বাদশাহ বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, **আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা** শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' বাদশাহর সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। **জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে,** অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।

যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল, **তখন এক পিপীলিকা বলল,** "হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় বাদশাহ ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।"

**তার কথা শুনে বাদশাহ মুচকি হাসলেন** এবং বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

বাদশাহ পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, **"কি হল, হুদহুদ পাখীকে দেখছি না কেন?** নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।"

**কিছুক্ষণ পড়েই হুদহুদ এসে বলল, "আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি।** আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি (রাণী বিলকিস)। তাকে সবকিছুই

দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।"

বাদশাহ বললেন, **"এখন আমি দেখব হুদহুদ তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী।** তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পন কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।"

**হুদহুদ পত্র নিয়ে রাণী বিলকিসের কাছে পৌঁছে দিল।** রাণী বিলকিস বলল, "হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র বাদশাহর পক্ষ থেকে এবং তা এই: সসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও"।(রাণী) আরও বলল, "হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না"। পরিষদবর্গ বলল, "আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন"। রাণী বিলকিস বলল, "রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি প্রেরিত লোকেরা কী জওয়াব আনে।"

অতঃপর যখন দূত বাদশাহর কাছে আগমন করল, তখন বাদশাহ বললেন, "তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা

তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত"। তিনি আরও বললেন, "হে পরিষদবর্গ, তারা আত্নসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?"

**জনৈক দৈত্য-জিন বলল,** "আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।"আরও বললো, **"আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।"**

অতঃপর বাদশাহ --যখন বিলকিসের সিংহাসন তার সামনে রক্ষিত দেখলেন তখন বললেন, "এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। বাদশাহ বললেন, "বিলকিসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই ?" অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তোমার সিংহাসন কি এরূপই?" ( বিলকিস) বলল, "মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি" ।আল্লাহর পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বিলকিসকে) বলা হল, "এই প্রাসাদে প্রবেশ কর"। যখন রাণী তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল।

বাদশাহ বলল, “এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ”।

রাণী বলল, “হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি বাদশাহর সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পন করলাম”।

------------------------------------------------------------------------------------

**>>> এ ধরনের গল্পকে "পুরাকাল উপকথা" ছাড়া আর কীভাবে আখ্যায়িত করা যায়?**

আরব্য উপন্যাসে এ ধরনের অনেক অনেক গল্প আছে। এহেন গল্পকে কোনো ব্যক্তি যদি **“সৃষ্টিকর্তার বাণী"** বলে জনগণের কাছে প্রচার করে নিজেকে সৃষ্টি-কর্তার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন বলে ঘোষণা দেন, তারপর জনগণকে তাদের "বাপ-দাদার ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান' বিসর্জন দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান জানান, আর তা না করলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ **হুমকি-ধমকি-শাসানী** দেয়া শুরু করেন, তাহলে জনগণ সে ব্যক্তির মানসিকতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন?

**হ্যাঁ, উক্ত গল্পটি কুরানের। সূরা নমল(২৭), আয়াত ১৬ থেকে ৪৪।** বাদশাহ সোলায়মানের গল্প। কুরানে এরূপ অবাস্তব অশরীরী অনেক গল্প আছে, যেগুলো অনেক রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ গল্পটিকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে প্রচার করে তাকে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর মক্কাবাসীরা এ গল্পগুলোকে **পূর্ববর্তীদের উপকথা** বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

**পৌরানিক নবী সম্বন্ধীয় মক্কায় আয়াত সংখ্যা নুন্যতম ১২৪০।** মক্কায় মুহাম্মদের প্রতি চারটি বাক্যের একটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের উপকথা। কুরানে পৌরাণিক নবীদের গল্প বারংবার বলা হয়েছে। যেমন (ন্যূনতম সংখ্যা):

**১) মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের গল্প ২১ বার,**

২) নূহের গল্প ১২ বার,

৩) ইবরাহিম (আঃ) এর গল্প ১২ বার,

৪) লূত (আঃ) এর গল্প ৯ বার,

৫) আ'দের গল্প ৮ বার,

৬) সালেহ ও সামুদের গল্প ৭ বার,

৭) আদম হাওয়া ও ইবলিস এর গল্প ৫ বার,

৮) দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এর গল্প ৫ বার,

৯) মাদায়েনের শোয়েব (আঃ) এর গল্প ৩ বার

## গবেষণায় (Research)আগ্রহী পাঠকদের জন্য বিস্তারিত:

**১) মুসা (আ:) ও ফেরাউনের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৪৯৭**

৭:১০৩-১৬৮, ১০:৭৫-৯২, ১৪:৫-৮, ১৭:১০১–১০৪, ১৮:৬০-৮২, ১৯:৫১-৫৩, ২০:৯-৯৭, ২১:৪৮, ২৩:৪৫-৪৯, ২৫:৩৫-৩৬, ২৬:১০–৬৮, ২৭:৭-১৪, ২৮:৩-৪৬, ৩৭:১১৪-১২২, ৪০:২৩-৪০, ৪৩:৪৬-৫৬, ৪৪:১৭-৩৩, ৫১:৩৮-৪০, ৫৪:৪১-৪৩, ৬৯:৯-১০, ৭৯:১৫-২৬।

**২) ইবরাহিম (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে)= ১৪৭**

১১: ৬৯, ১৪:৩৫, ১৫:৫১-৬০, ১৬: ১২০, ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩ (টুকরা টুকরা করে মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছিল - ২১:৫৭), ২৬:৬৯-১০৪, ২৯:১৬-২৭, ৩৭:৮৩-১১৩, ৩৮:৪৫-৪৮, ৪৩:২৬-৩০, ৫১:২৪- ৩৬।

**৩) নূহের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে)= ৯৯**

৭:৫৯-৬৪, ১০:৭১-৭৩, ১১: ২৫-৪৮ (নূহের নৌকা), ১৪: ৯, ২১:৭৬-৭৭, ২৩:২৩-৩০, ২৫:৩৭, ২৬:১০৫-১২২, ২৯:১৪-১৫ (নূহ বেঁচেছিলেন ৯৫০ বছর) ৩৭:৭৫-৮২, ৫৪:৯-১৫ (নূহের নৌকা), ৭১: ১-২৮।

**৪) আদম হাওয়া ও ইবলিস এর গল্প, মোট আয়াত(কমপক্ষে) = ৮২**

৭:১১–৭:২৫, ১৫:২৬-৫০, ১৮:৫০, ২০:১১৫, ৩৮:৭১-৮৫।

**৫) হুদ এবং আ'দের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৭০**

৭:৬৫-৭২, ১১:৫০ -৬০, ২৫:৩৮, ২৬:১২৩-১৪০, ২৯:৩৮, ৪৬:২১-২৬, ৫৪:১-২১, ৬৯:৪- ৮।

**৬) লূত (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে)= ৬৪**

৭:৮০-৮৪, ১১: ৭৭-৮৩, ১৫:৬১-৭৫, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৪, ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫৪:৩৩।

**৭) দাউদ ও সোলায়মান (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৬১**

২১:৭৮-৮২, ২৭:১৫-৪৪, ৩৪:১০-১৪, ৩৮:১৭-২৬, ৩৮:৩০-৪০।

**৮) সালেহ ও সামুদের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৬০**

৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ২৬:১৪২-১৫৯, ২৭:৪৫-৫৩, ৫১:৪১-৪৫, ৫৪:২৩-৩১, ৯১::১১-১৪।

**৯) মাদায়েনের শোয়েব (আ:), মোট আয়া(কমপক্ষে)ত = ৩৮**

৭:৮৫-৯৪, ১১:৮৪- ৯৫, ২৬:১৭৬-১৯১।

**১০) ঈসা মাতা মরিয়ম, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ২০**

১৯:১৬-৩৪, ২১:৯১।

**১১) জুল-কারনাইনের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১৮**

১৮:৮৩-৯৮, ২১:৮৭- ৮৮।

**১২) জাকারিয়া (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১৫ :**

১৯:২-১৫. ২১:৮৯।

**১৩) নূহের পরে আরেক সম্প্রদায়ের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে)= ১১**

২৩:৩১-৪১।

**১৪) ইউনুস (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১০**

৩৭:১৩৯-১৪৮।

**১৫) ইলিয়াস (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১০**

৩৭:১২৩-১৩২।

**১৬) অন্যান্য গল্প**:

আয়ুব (আ:), ইসমাইল (আ:), ইদ্রিস (আ:), ঈসা (আ:), লোকমান (আ:), ইউসুফ (আ:), সাবাহর বাসিন্দাদের গল্প, ইয়াযুদ–মাযুদ:, কারুন - ইত্যাদি।

>>> বংশ পরম্পরায় শুনে আসা পুরাকালের এহেন মুহাম্মদের গল্পগুলোকে তার **"নবুয়তের প্রমাণ"** এবং তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে না নেয়াকে অপরাধ আখ্যা দেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু প্রবক্তা মুহাম্মদ কুরাইশদেরকে শুধু অপরাধী সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হননি। করেছিলেন উপর্যুপরি তাচ্ছিল্য, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, শাসানী, ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ। পাঠক, আপনারা এহেন গল্পগুলোকে পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কীভাবে মূল্যায়ন করতেন? আপনারা কি এহেন গল্পকারকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিতেন?

**দ্বিতীয় অভিযোগ: মুহাম্মদ নিজে কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্যে করেছে**

মুহাম্মদের দাবীর অসারতার স্বপক্ষে অবিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে অভিযোগটি করতেন তা হলো, **"'মুহাম্মদ যা প্রচার করছেন, তা তার নিজেরই কথা'।** মুহাম্মদ নিজে তা রচনা করেছে এবং অন্য লোকেরাও তাকে সাহায্য করেছে"। **মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়:**

২৫:৪- কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, **যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে।** অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

৪৪:১৪- অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-**শিখানো কথা বলে।**

১১:৩৫- তারা কি বলে? **আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন?** আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

৪৬:৭-৮- যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। তারা কি বলে যে, **রসূল একে রচনা করেছে?** বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। ---

৫২:৩৩- **এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে?** বরং তারা অবিশ্বাসী।

**এহেন অভিযোগের জবাবে প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে দিচ্ছেন কৈফিয়ত:**

৬৯:৪০-৪৩- **নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত।** এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয় বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। **এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।**

২১:৫- এছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; **না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি।** অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শন সহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগন।

>>> যে কোনো চিন্তাশীল মানুষই জানেন যে, **আলোচ্য কৈফিয়তগুলো স্বগতোক্তি। সদুত্তর নয়।** কুরাইশরা মুহাম্মদের (আল্লাহ) এহেন জবাবে স্বাভাবিকভাবেই কোনো

বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজে পাননি। তাঁরা **দৃঢ়ভাবে** বিশ্বাস করতেন যে, মুহাম্মদ নিজে বানিয়ে বানিয়ে আল্লাহর নামে তার নিজেরই 'বাণী' প্রচার করে চলেছেন। তাঁরা মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের প্রমাণ দাবী করলেন। নিঃসন্দেহে **যুক্তিসংগত দাবী।** প্রত্যুত্তরে মুহাম্মদ তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। মুহাম্মদ যে শুধু পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ 'নিদর্শন' আনয়নে **ব্যর্থ হয়েছিলেন** তাইই নয়, জবাবে হুমকি-শাসানি ও ভীতি প্রদর্শনও বাদ রাখেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো 'মোজেজা তত্ত্বে'।

মুহাম্মদ আরও দাবী করেছেন যে, সম্পূর্ণ কুরান তার আল্লাহর কাছে লিখিত আছে "সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে" (৮০:১৩-১৫)। তার এই দাবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কুরাইশরা মুহাম্মদকে আহ্বান করেছিলেন **'সম্পূর্ণ কিতাবটি' একবারে নাজিল করতে।** যদি বাণীগুলো আগে থেকেই লেখা থাকে, তবে মুহাম্মদ সম্পূর্ণ কুরান একসঙ্গে অবতীর্ণ করতে পারবেন। আর যদি সে **"বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে"** একটু একটু করে তা অবতীর্ণ করেন তবে তা মুহাম্মদের নিজের বা অন্যের সাহায্য বানানো। **প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,**

২৫:৩২- " সত্য প্রত্যাখানকারীরা বলে, **তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন?"**

**জবাবে মুহাম্মদের (আল্লাহ) কৈফিয়ত,**

"আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি **আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে"**(২৫:৩২)।

**>>> এহেন কৈফিয়ত কী আদৌ বিশ্বাস যোগ্য?** এক দিকে মুহাম্মদ দাবী করছেন, তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ নবী। কিন্তু সেই বিশেষ সৃষ্টির ৪০ পরবর্তী বয়সেও তাঁর বর্ণিত সৃষ্টিকর্তাটি তাঁকে **"মজবুত" অন্তঃকরণের অধিকারী করতে ব্যর্থ!** ব্যর্থ সেই সৃষ্টিকর্তাটি **"অ-মজবুত** অন্তঃকরণের অধিকারী মুহাম্মদের উপর সম্পূর্ণ কুরান এক সঙ্গে অবতীর্ণ না করে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু নাজিল করছেন! কারণ? যাতে তাঁর **নবীর অন্তঃকরণ** মজবুত হয়"! এ উদ্ভট দাবী কী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? এখানেই শেষ নয়! যে সৃষ্টিকর্তা নবীর মনকেই মজবুত করতে ব্যর্থ, সেই আবার পরক্ষণেই তার সেই বানী যদি **"সাধারণ জনগণ"**বিশ্বাস না করেন তবে তাদেরকে করছে অভিশাপ! করছে কানে-চোখে-অন্তঃকরনে সিল মেরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত, হুমকি দিচ্ছে কঠোর শাস্তির **(২:৭)!** এসব উদ্ভট যুক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাকে (যদি থাকে) নিয়ে **স্রেফ তামাসা** বই আর কিছু কি হতে পারে?

**প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে আরও কৈফিয়ত দিয়েছেন,**

১৬: ১০৩- **আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।**

>>> মক্কায় বসবাসকারী এক বিদেশী খ্রিষ্টানের কামারের (Blacksmith) দোকান ছিল। যেখানে তিনি ঘোড়ার ক্ষুর তৈরি করতেন। মুহাম্মদ সেই দোকানে প্রায়শঃই আনাগোনা করতেন। কুরাইশদের দাবী, ঐ অনারাবীর কাছে মুহাম্মদ ধর্মীয় অনেক কাহিনী শিখে পরবর্তীতে তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করতেন। কুরাইশদের এহেন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিদেশী লোকটিকে উদ্দেশ্য করেই উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। যেহেতু লোকটি সেখানে কামারের ব্যবসা করতেন, যৌক্তিকভাবেই ধারণা হয় যে,

লোকটি **আরবি ভাষা** রপ্ত করেছিলেন। যদি ধরেও নিই যে, ঐ ব্যক্তিটি আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি ঐ মানুষটির কাছ থেকে দোভাষীর মাধ্যমে তথ্য জেনে তা আরবি ভাষায় বয়ান করা যাবে না, এমন যুক্তি খুবই হাস্যকর।

মুহাম্মদ ছাড়াও কুরানের অন্যান্য সম্ভাব্য রচনাকারীদের সম্মন্ধে জানতে আগ্রহী পাঠকদের লেখক **আবুল কাশেমের তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাধর্মী "Who Authored the Quran"** প্রবন্ধটি পড়ার অনুরোধ করছি।

কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মুহাম্মদের (আল্লাহ) প্রচারিত এহেন **গল্প ও কৈফিয়তকে** সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে বিশ্বাস করবেন না। কুরাইশরাও বিশ্বাস করেননি। তাঁরা মুহাম্মদের কাছে পৌরাণিক নবীদের অনুরূপ **অলৌকিক কিছু** তার নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে বলেছিলেন। এ ক্ষেত্রে কুরাইশদের আচরণ ছিল খুবই **যুক্তিসম্মত।** যে কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষই এহেন দাবিদার ও গল্পকারের কাছে অনুরূপ **প্রমাণ** স্বাভাবিকভাবেই চাইতে পারেন। প্রত্যুত্তরে প্রবক্তা মুহাম্মদ তাদেরকে কী জবাব ও হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে।

মুহাম্মদ এবং তাঁর বিশ্বাসে বিশ্বাসী মুসলমানেরা কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের "জাহিলিয়া (অন্ধকার-যুগ/জীব)" আখ্যা দেয়। যে কোনো ইসলামী প্রচারণায় তাঁদেরকে করা হয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! সত্যিই কি তাঁরা অসাধু-অমানুষ-অসহনশীল-মানবতাহীন নির্বোধ ছিলেন? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো 'আইয়ামে জাহেলিয়াত তত্ত্ব' পর্বে।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৮: এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই!– দুই

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তাতে অবিশ্বাসীরা কেন "সন্দেহ পোষণ" করতেন, তা কুরানে অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের তিনটি অভিযোগের প্রথম দুইটির আলোচনা আগের পর্বে (সপ্তদশ) করা হয়েছে। মুক্তচিন্তার পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে, **অবিশ্বাসীদের অভিযোগ গুলো ছিল যথার্থ।** তাদের সে অভিযোগের কোনো সদুত্তরই মুহাম্মদ (আল্লাহ) দিতে পারেননি। তাদের তৃতীয় অভিযোগটি ছিল সবচেয়ে গুরুতর!

## তৃতীয় অভিযোগ: মুহাম্মদ প্রেরিত ব্যক্তি নন, সে মিথ্যাবাদী, উন্মাদ / যাদুগ্রস্ত

## প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়:

### মিথ্যাবাদী

২২:৪২- তারা যদি আপনাকে **মিথ্যাবাদী** বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, সামুদ,

২৯:১৮- তোমরা যদি **মিথ্যাবাদী** বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব।

৩৪:৪৩- যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, **এটা মনগড়া মিথ্যা** বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৩৫:৪- তারা যদি আপনাকে **মিথ্যাবাদী** বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

৩৮:৪- তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক **মিথ্যাচারী** যাদুকর।

## উম্মাদ

১৫:৬- তারা বললঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন **উম্মাদ।**

২৩:৭০- না তারা বলে যে, তিনি **পাগল ?** বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

৩৪:৭-৮ -কাফেররা বলে,--- সে আল্লাহ সম্পর্কে **মিথ্যা বলে**, না হয় সে **উম্মাদ** এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

৩৭:৩৬- বলত, আমরা কি এক **উম্মাদ** কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।

৬৮:৫১- কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন **পাগল।**

## যাদুগ্রস্ত (Bewitched)

১৭:৪৭- যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালেমরা বলে, তোমরা তো এক **যাদুগ্রস্ত** ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

২৫:৮- জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন **যাদুগ্রস্ত** ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

>>> পাঠক, অবিশ্বাসীদের কথা আপাতত স্থগিত রেখে বিশ্বাসী মুমিনদের উদ্ধৃতি জানা যাক। বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর **সর্বপ্রথম** পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮) লিখেছেন:

**মুহাম্মদের দুধ মাতা হালিমা জানিয়েছেন**,

'তার (হালিমার ছেলে) পিতা আমাকে বললেন, "আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে, ছেলেটি (মুহাম্মদ) মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত (stroke), পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পূর্বেই তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে এসো।" তাই আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিতে গেলাম। তার মা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমরা তাকে ফেরত নিয়ে এসেছি যদিও তার কল্যাণ কামনায় আমি উদ্বিগ্ন এবং তাকে আমি আমার কাছে রাখতে ইচ্ছুক। আমি তাকে (মুহাম্মদের মা আমিনা) বললাম, "এতদিন ঈশ্বর আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে এবং আমি আমার কর্তব্য করেছি। আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে বিপদ তাকে স্পর্শ করবে। তাই আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমি তাকে (মুহাম্মদ) আপনার কাছে ফেরত নিয়ে এসেছি।" তিনি জানতে চাইলেন আসলে কী ঘটেছে এবং সেই কারণটি তাঁকে জানাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাকে স্বস্তি দেননি। তিনি জানতে চাইলেন, আমি তাঁকে (মুহাম্মদ) পিশাচগ্রস্ত (Possessed demon) জেনে ভীত কি না। আমি জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, কোনো পিশাচের সাধ্য নাই যে আমার ছেলেকে স্পর্শ করে… (তারপর উদ্ভট/অলৌকিক কিচ্ছা)। - (অনুবাদ: লেখক)

(His father said to me, "I am afraid that this child has had a stroke, so take him back to his family before the result appears." So we picked him up and took him to his mother who asked why we had brought him when I had been anxious for his welfare and desirous

of keeping him with me. I said to her, "God has let my son live so far and I have done my duty. I am afraid that ill will befall him, so I have brought him back o you as you wished." She asked me what happened and gave me no peace until I told her. When she asked if I feared a demon possessed him, I replied that I did. She answered that no demon had any power over her son who had a great future over him, and then she told how when she was pregnant with him a light went out from her which illuminated the castles of Busra in Syria and she had borne him with the least difficulty imaginable. When she bore him he put his hands on the ground lifting his head towards the heavens. "Leave him then and go in peace," she said.']

Reference: Ibne Hisham (d 833 CE) 'Sirat Rasul Allah -byIbne Ishaq (704-768) ed M al Saqqa et al, Cairo, 1936. Translated by A. Guillaume, Oxford university press, First Published 1955. Page - 72)

**সহি বুখারী, ভলিউম: ৪, বই ৫৩, নম্বর ৪০০**

আয়েশা হতে বর্ণিত,

একদা নবী এমন **যাদু-গ্রস্ত** হয়েছিলেন যে, ভ্রমের বশে এমন সব কাজের কথা তিনি করেছেন বলে বলতেন, যা তিনি আদৌ করেননি। (অনুবাদ: লেখক)

**সহি বুখারী, ভলিউম: ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪৯০**

আয়েশা হতে বর্ণিত,

নবীর ওপর **যাদুর আছর** হলে ভ্রমের বশে এমন সব কাজের কথা তিনি করেছেন বলে বলতেন, যা তিনি আদৌ করেননি। একদা তিনি অনেকক্ষণ প্রার্থনার পর ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর ইচ্ছায় আমি আমার রোগের উপশম জানি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে (স্বপ্নে) এসে বসলো, একজন আমার শিয়রে আর আরেকজন আমার পায়ের কাছে।

একজন অপরজনকে বললো,"এই লোকটির কী অসুখ?"

অপরজন বললো, **"সে যাদুগ্রস্ত।"**

প্রথম জন বললো,"কে তাকে যাদু করেছে?"

অপরজন বললো,"লুবায়েদ বিন আল-আসাম।"

প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, "কী দিয়ে?"

জবাবে অন্যজন বললো, "একটা চিরুনি, তার সাথে জড়ানো চুল এবং খেজুর গাছের ছাল।"

প্রথম জন বললো, "কোথায় সেটা?"

অপরজন উত্তর দিল, "সেটা ধাওয়ানের কুয়ায়।"

নবী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর ফিরে এসে আমাকে বললেন, "খেজুর গাছগুলো (কুয়ার পাশের) ছিল শয়তানের মাথার মত।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ঐ যাদুর সামগ্রীগুলোকে তুলেছেন?"

তিনি বললেন, "না, কারণ আল্লাহ আমার নিরাময় করেছেন এবং আমি শঙ্কিত যে, এই কাজটি মানুষের ক্ষতির কারণ হবে।"

পরে এই কুয়াটিকে মাটি চাপা দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।'

(অনুবাদ: লেখক)

>>> সুতরাং যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, শুধু অবিশ্বাসীরাই নয়, মুহাম্মদের দুধ-মাতা হালিমা এবং তার সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মীনি আয়েশা (রাঃ) ও আমাদের জানাচ্ছেন যে, সেই ছোটকাল থেকেই **মাঝে মাঝে** মুহাম্মদ অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। বাস্তবে যে কাজ তিনি করেননি, তাইই করেছেন বলে দাবী করতেন।

**জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ** জোগানোর নিমিত্ত সমগ্র কুরানে একটিও স্পষ্ট বাণী নেই (আশ্চর্য নয় কেন মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্বনিম্ন)! কিন্তু অবৈজ্ঞানিক অশরীরী **জিনদের নামে** একটি পূর্ণ সুরা কুরানে বিদ্যমান (৭২ নম্বর)। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) ঘোষণা দিয়েছেন:

৭২: ১-১৫- “-- **জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে,** অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। অনেক মানুষ অনেক **জিনের আশ্রয়** নিত, ফলে তারা জিনদের

আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করত পরব না। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।"

>>> **জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে** (Meteorites) মুহাম্মদ জিন/শয়তান তাড়ানোর হাতিয়ার বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (বিস্তারিত দ্বিতীয় পর্বে)।

জিনদের নিয়ে কুরানে আরও যে আয়াতগুলো আছে, সেগুলো হচ্ছে:

১৫:২৭-২৮- --এবং জিনকে এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি।
৩৪:১২- আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার

আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব।

৩৭:১৫৮- তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে।

৫১:৫৬- আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

এ ছাড়াও,

৬:১০০, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ২৭:৩৮-৩৯, ৪৬:২৯-৩০, ৫৫:৩১-৩৫ - ইত্যাদি।

>>> সুরা জিনের শানে নজুলে ইমাম বুখারী **(সহি বুখারী, ৬:৬০:৪৪৩)** আমাদের জানাচ্ছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উকাজ বাজারে যাওয়ার পথে নাখলা নামক স্থানে ফজর নামাজরত অবস্থায় জিনদের একটি দল (তাঁর সাথে সাক্ষাতে) কুরানের মহান বাণী শুনে বিমোহিত হোন। তারা কুরানের ঠিক কোন আয়াতটি এবং কতটুকু শুনেছিলেন, তার উল্লেখ এ হাদিসে নেই। ফজর নামায মাত্র চার রাকাত। এই অল্প সময়ে এই অশরীরীরা যে খুব বেশি কিছু শুনতে পারেননি, তা সহজেই অনুমেয়।

বরাবরের মতই মুহাম্মদের আশেপাশে অবস্থিত অন্যান্য সাহাবীদের কেউই এই জীবটিকে দেখেননি। কিংবা তাদের কথোপকথনও শোনেননি। মুহাম্মদ একাই তা শুনেছেন ও দেখেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই মানসিক উপসর্গটিকে **দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির বিভ্রম** (Visual and auditory Hallucination) নামে আখ্যায়িত করা হয়। জিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হলেও এক বিশেষ ধরনের মানসিক রুগীরা যে এই মতিভ্রম উপসর্গের শিকার, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ প্রমাণিত।

**সুতরাং অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে কেন "পাগল" বলে আখ্যায়িত করতেন তার ব্যাখ্যা কুরান-হাদিসেই বিদ্যমান।**

মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে হাজার-হাজার মিথ্যাচার ও অতিকথা (Myth) সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। প্রশ্ন হলো, **কেন এ মিথ্যাচার?** কেন এ অতিকথা? এর কারণ বুঝতে হলে আমাদেরকে আবারও ফিরে যেতে হবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষায়। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী মুহাম্মদের (আল্লাহ) বশ্যতা স্বীকার বাধ্যতামূলক এবং তাঁর প্রশংসা করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। **বাকস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে রহিত!**

প্রবক্তা মুহাম্মদ তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে কুরানে বহুবার নিজেই **নিজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।** 'মহান চরিত্রের অধিকারী **(৬৮:৪);** বিশ্বাসভাজন **(৮১:২১);** বিশ্ববাসীর রহমত **(২১:১০৭);** সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদাতা **(৩৩:৪৫);** উজ্জ্বল প্রদীপ **(৩৩:৪৬)**'- ইত্যাদি, ইত্যাদি স্বঘোষিত বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন নিজেকে। কিন্তু **নির্জলা সত্য** হলো, কুরানের অসংখ্য বাণী ও সিরাত-হাদিসের নৃশংস-অমানবিক ঘটনার বর্ণনা মুহাম্মদের এ সকল দাবীর অসাড়তার উজ্জ্বল সাক্ষী! অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে জানতেন একজন **মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত** (Forger) রূপে। অসংখ্য বাক্যে মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের করছেন অভিশাপ (একাদশ পর্ব) । নেতৃত্ব দিয়েছেন নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কাফেলায় ডাকাতি, সম্পত্তি লুট, ভূমিদখল, সন্ত্রাস ও খুনের মত বীভৎস কর্মকাণ্ডে (দ্বাদশ পর্ব)! যে কোন সাধারণ বিবেকবান মানুষই জানেন যে, কোনো ব্যক্তির **'স্বঘোষিত আত্ম-প্রশংসা'** কোনোক্রমেই সেই ব্যক্তির সত্যবাদিতার প্রমাণ হতে পারে না। অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই। এমত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের বাণীকে অভ্রান্ত ও তাঁকে বিশ্বাসী, সত্যবাদী, চরিত্রবান ও রহমতের আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কী?

## উপায় মাত্র দুটি:

১) **হুমকি-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমালোচনাকারীদের কঠোর হস্তে দমন।** যাতে বিরুদ্ধবাদীরা কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্যের সাহসই না পায়!

২) **নেতিবাচক তথ্যগুলোকে গোপন অথবা বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা।**

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত এমত পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্যের মোড়কে প্রতিষ্ঠিত করা যে সম্ভব, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ইসলাম। গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ ও তাঁর প্রবর্তিত ইসলামের সমালোচনাকারীকে অমানুষিক পৈশাচিকতায় দমন করা হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পীড়নযন্ত্রের মাধ্যমে সে সব মুক্তমনাদের জর্জরিত করা হয়েছে শারীরিক ও মানসিক আঘাতে। আজকের পরিস্থিতিও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা পৃথিবীবাসী প্রতি নিয়তই প্রত্যক্ষ করছেন!

মুহাম্মদের যাবতীয় উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী, স্বঘোষিত **নির্জলা মিথ্যা** আত্ম-প্রশংসা, অমুসলিমদের প্রতি তার যাবতীয় **ঘৃণা-হিংসা-ত্রাস-অমানবিক বিধান**– ইত্যাদি, ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবার প্রয়োজনেই মুহাম্মদ অনুসারী/পণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবত এ দু'টি উপায় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুশীলন করে আসছেন। সত্যকে মিথ্যার বেড়াজালে বন্দী করার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে হাজারও মিথ্যাচার ও অতিকথা (Myth)! ফলস্বরূপ, ইসলামের ইতিহাসে হাজারো মিথ্যাচারের বেসাতী! মুহাম্মদ ও তার বাণীকে **"অভ্রান্ত"** প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনেই ইসলাম বিশ্বাসীদের তা করতে হয়েছে অতীতে! করতে হচ্ছে বর্তমানে! করতে হবে ভবিষ্যতে!

মুহাম্মদ ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পিতৃ-মাতৃ স্নেহবঞ্চিত ৭ম শতাব্দীর এক আরব বেদুইন। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের মতই ছিল তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, ভুল-ভ্রান্তি, ভাল-মন্দ, মানবিক /অমানবিক ইত্যাদি যাবতীয় দোষ-গুণ ও দুঃখ-শোকের জীবন! পৃথিবীর সকল মানুষের মত তিনিও ছিলেন চিন্তা-চেতনা-কর্মে তাঁর **স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতায়।** এই চরম সত্যটিকে যাঁরাই অস্বীকার করে মুহাম্মদের যাবতীয় বাণী ও কর্মের বৈধতা দেবার জন্য "ঐশী" শক্তির দ্বারস্থ হবেন, তাঁদেরকেই ঘুরপাক খেতে হবে 'মুহাম্মদ <>আল্লাহ<> মুহাম্মদ<>আল্লাহ>' **চক্রের** গোলকধাঁধায়।

## মিথ্যাবাদী/জালিয়াত বনাম মহা-বিশ্বাসভাজন (আল-আমিন)

পৃথিবীর সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন! যে কোনো ইসলামী আলোচনা ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে তাঁরা উচ্চস্বরে প্রচার করেন, "অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আল-আমিন নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।"
কিন্তু কুরানে আমরা কী দেখছি?

দেখছি, মুহাম্মদের নিজেরই জবানবন্দী তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী! শুধু একটি বা দু'টি বাক্য নয়, কুরানের বহু বাক্যে যে-সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো মুহাম্মদের পরিপার্শ্বিক প্রায় সমস্ত মানুষই মুহাম্মদকে জানতেন মিথ্যাবাদী/জালিয়াত হিসাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মক্কায় মুহাম্মদের ১২-১৩ বছরের অক্লান্ত প্রচারণার ফসল সর্বোচ্চ ১৩০ জন অনুসারী। এই অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক অনুসারী ছাড়া তার পরিপার্শ্বের অন্যান্য সবাই ছিলেন অবিশ্বাসী, যাঁরা মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।

**মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসী দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র।** মিথ্যাবাদী তাকেই বলা হয়, যাকে বিশ্বাস করা যায় না।

**ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো কুরান। সেই কুরানেরই আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, "মুহাম্মদের আল-আমীন উপাধিটি ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি!"**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ১৯: এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই!- তিন
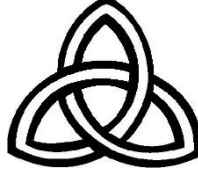
স্বঘোষিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত বাণীতে অবিশ্বাসীরা কেন **"সন্দেহ পোষণ"** করতেন তার বিশদ আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর (কুরান) আলোকে যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের তিনটি মূল অভিযোগের কোনোটিরই সদুত্তর দিতে পারেননি। মুক্তচিন্তার পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে অবিশ্বাসীদের অভিযোগগুলো ছিল যথার্থ! তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগেরই যে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে তা স্বয়ং মুহাম্মদেরই চারণকৃত আত্মজীবনীগ্রন্থের (কুরানে) পর্যালোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট! মুহাম্মদ যে **মাঝে মধ্যেই** অস্বাভাবিক আচরণ করতেন সে সত্যটিও কুরান-সিরাত-হাদিসের আলোকে আজ প্রমাণিত। শারীরিক এবং/অথবা মানসিক অসুস্থতার কারণে মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই মুহাম্মদ যে সুস্থ-সবল দেহ মনের অধিকারী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায় (বিস্তারিত দ্বাদশ পর্বে)।

অবিশ্বাসীদের এহেন সন্দেহ ও অভিযোগের জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) যে সকল কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল মূলত: **চার প্রকার:**

১) দিয়েছেন **কৈফিয়ত**। তারপর

২) করেছেন **নিজেরই ভূয়সী প্রশংসা।** অতঃপর

৩) **হুমকি ও প্রলোভন।** এবং

৪) **প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান**

## ১) আত্মপক্ষ সমর্থনে মুহাম্মদের (আল্লাহ) কৈফিয়ত!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

### মুহাম্মদ অতীন্দ্রিয়বাদী নন

৫২:২৯-৩০- অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় **আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উম্মাদও নন।** তারা কি বলতে চায়: সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি।

### মুহাম্মদ উম্মাদ নন

৬৮:২- আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে **আপনি উম্মাদ নন।**

### মুহাম্মদের বাণী শয়তানের উক্তি নয়

৮১:২২-২৫- তোমাদের সাথী পাগল নন। তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। **এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।**

## ২) তারপর, নিজেরই ভূয়সী প্রশংসা!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

## মুহাম্মদ মহান চরিত্রবান

৬৮:৩-৪- আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আপনি **অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।**

## মুহাম্মদ বিশ্ববাসীর রহমত

২১:১০৭– আমি আপনাকে **বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত** স্বরূপই প্রেরণ করেছি।

## মুহাম্মদ উজ্জ্বল প্রদীপসম

৩৩:৪৫-৪৬- আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং **উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।**

## মুহাম্মদ সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদাতা

৩৪:২৮- আমি আপনাকে **সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা** ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

## মুহাম্মদ আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী-সবার মান্যবর-বিশ্বাসভাজন

৮১:১৯-২১- নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, যিনি শক্তিশালী, **আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী**, সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।

## সৃষ্টিকর্তা নিজে মুহাম্মদের প্রতি করেন রহমত প্রেরণ

৩৩:৫৬- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি **রহমত প্রেরণ** করেন।

>>> আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির এই যুগে আধুনিক চিকিৎসকরা পরিপার্শ্বের জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে মুহাম্মদের মত "এহেন Special" দাবীদারদের জরুরী ভিত্তিতে (Psychiatric emergency) **মানসিক হাসপাতালের তালাবন্ধ কক্ষে** ভর্তি করেন।

## ৩) অত:পর, যথারীতি হুমকি ও প্রলোভন!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

৮৪:২০-২৫- অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না। বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা জানেন। অতএব, তাদেরকে **যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির** সুসংবাদ দিন। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে **অফুরন্ত পুরস্কার।**

## ৪) এবং, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান (Challenge)

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

২: ২৩- এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত **একটি সূরা রচনা** করে নিয়ে এস| তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো|

১০:৩৮- মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনছে? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো **একটি সূরা**, আর ডোকে নাও, যাদরেকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

১১:১৩- তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও **অনুরূপ দশটি সূরা** তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।

১৭:৮৮- বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের **অনুরূপ রচনা** করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

৫২: ৩৩-৩৪- না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর **অনুরূপ কোন রচনা** উপস্থিত করুক।

>>> মুহাম্মদের বর্ণিত স্রষ্টা (আল্লাহ) তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের বাসনায় তার অস্তিত্বে অস্বীকারকারীদের সাথে **"সূরা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ"** জানিয়েছেন! কম পক্ষে ৫ বার! **এ কোন স্রষ্টা** যে তার অস্তিত্বে অস্বীকারকারীদের সাথে সুরা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছেন?

প্রবক্তা কি জানতেন যে আমাদের এই **দৃশ্যমান জগতটিই** ৯৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ পরিবৃত একটি স্থান? (এক আলোক বর্ষ = ছয়শ হাজার কোটি (Six Trillion) মাইল)

প্রবক্তা কি জানতেন যে আমাদের এই জগতটি হতে পারে অনন্ত-মহাবিশ্বের (Multiverse) কোটি কোটি অনুরূপ মহাবিশ্বের একটি?
প্রবক্তা কি জানতেন যে এ ছাড়াও আছে **অদৃশ্যমান জগত**: অণু, পরমাণু, কোয়ার্ক, কোষ-DNA/RNA, ডার্ক ম্যাটার - ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি?
প্রবক্তা কি জানতেন যে মানুষের এই আবাসস্থলটি অত্যন্ত **ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র** একটি স্থান?
প্রবক্তা কি জানতেন যে মানুষ নামের এই **প্রজাতিটি** বর্তমানে জীবিত দৃশ্যমান ১৭ লক্ষ প্রজাতির একটি? এ ছাড়াও আছে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার অদৃশ্য জগৎ?
তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে যে-মানুষের সাথে সে "প্রতিযোগিতার" আহ্বান জানাচ্ছেন তার **উদ্ভব হয়েছে** মাত্র দুই লক্ষ বছর আগে? বিশ্বসৃষ্টির ১৩৫০ কোটি বছর পরে? আর তারা **কবিতা লেখা শুরু** করেছে সামান্য কয়েক হাজার বছর আগে?

**এ তথ্যগুলোর যে কোনো একটির সঠিক জবাব জানা থাকলে মানুষের সাথে "প্রতিযোগিতা" আহ্বানের আগে তিনি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতেন!**

এই সুবিশাল চমকপ্রদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদৌ কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, এমন কোনো **প্রমাণ নাই।** আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করছে যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই (Fundamental laws of Nature) তথাকথিত কোনো স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই একদম **"শূন্য (নেই) থেকে**"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হতে পারে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে অপরের জীবনযাত্রা প্রণালীর ওপর **কোনোরূপ** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কটাক্ষ-তাচ্ছিল্য-অসম্মান-অসুবিধা-হুমকি বা হস্তক্ষেপ না করে একান্ত ব্যক্তিগত স্বস্তি ও সুখ পেতে চান, তবে তাঁকে তাঁর **ব্যক্তিগত ব্যাপার** বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি তিনি দাবী করেন যে এই অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা (যদি থাকে) তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উগ্র বাসনায় অবিশ্বাসীদের সাথে **"জাতীয় বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট"** সাদৃশ্য

প্রতিযোগিতায় (যেমন, বাংলাদেশে  ক্লোজ-আপ ওয়ান বা চ্যানেল আইয়ের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অথবা World cup football/cricket/heavy weight champion) অংশ নিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীদের সমুচিত জবাব দিতে চান!। অথবা তিনি যদি ঘোষণা দেন যে বিশ্বস্রষ্টা আকাশ থেকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের কুচক্রী শাসক/রাজনীতিবিদদের মত পাঠান  লাঠি-সোঠা-চাকু-ছুরি-পিস্তল-মেশিন গান সজ্জিত **খুনী ক্যাডার বাহিনী,** তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো, এরূপ ব্যক্তি হয় এই মহাবিশ্বের বিশালতা বিশয়ে **সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এবং/অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন!** না, মুহাম্মদ (আল্লাহ) কোন "সংগীত প্রতিযোগিতার" আহ্বান জানাননি; জানিয়েছেন **"সুরা প্রতিযোগিতার"** আহ্বান! তিনি কোনো "পিস্তল-মেশিন গান" সজ্জিত ক্যাডার বাহিনী পাঠান নাই; পাঠিয়েছেন **"ঢাল-তলোয়ার"** সজ্জিত ফেরেশতাকুল! **[সুরা আনফাল: ৮:৯, ৮:১২-১৭]**

**প্রায় সমকক্ষ না হলে** কেউ কারো কাছেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায় না। একজন শক্তিমান মানুষ কখনোই তার শক্তিমত্তায় অস্বীকারকারী পিপীলিকাকে (কিংবা অত্যন্ত দুর্বল কোনো মানুষকে) তার সাথে শক্তিমত্তা প্রতিযোগিতার আহবান জানাবেন না! জগৎশ্রেষ্ঠ কোনো বিজ্ঞানী তাকে অস্বীকারকারী অশিক্ষিত কৃষকের কাছে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার আহ্বান জানবেন না! কিংবা বিখ্যাত কোনো কবি কখনোই তার অস্বীকারকারী অর্বাচীন শিশুর কাছে কবিতা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানবেন না! সমকক্ষ জ্ঞান না করলে এমন আচরণ কি কেউ করতে পারেন? যদি করেন, তবে তা যে তার **মস্তিষ্ক বিকৃতিরই উপসর্গ** এ ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে?

প্রবক্তা মুহাম্মদ যদি মস্তিষ্ক বিকৃত না হোন তবে আমাদের মানতেই হবে যে তাঁর বর্ণিত স্রষ্টা মানুষেরই সমকক্ষ। **কে সেই "আল্লাহ"?** সে "আল্লাহ তিনি নিজেই! মুহাম্মদ বিন

আবদ-আল্লাহ! কারণ, মুহাম্মদই সেই পুরুষ যে বার বার তাকে অস্বীকারকারীর সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সুরা প্রতিযোগিতার আহবান জানিয়েছেন? কারণ, মুহাম্মদই সেই পুরুষ যে তার পরিপার্শ্বের মানুষের **স্বীকৃতি লাভের চেষ্টায় ছিলেন মরিয়া!** এতটায় মরিয়া যে যে-কোনো মূল্যে তাঁর তা চাইই চাই! হুমকি-ধমকি-প্রলোভন-শাস্তি ইত্যাদি এমন কোনো পন্থা নেই যা তিনি তার পরিপার্শ্বের মানুষের ওপর প্রয়োগ করেননি!

## মুমিনদের সন্দেহ

এখন দেখা যাক সমসাময়িক **বিশ্বাসী মুসলমানেরা** প্রবক্তা মুহাম্মদের বাণীগুলোকে **নিঃসন্দেহে পালন** করতেন কি না। কুরান-সিরাত-হাদিস সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বাসীদেরও অনেকে মুহাম্মদের আদেশ নিষেধকে পালন করতেন না। যাদের অনেককে মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য **যথারীতি প্রলোভন, হুমকি-শাসানী** কিছুই বাদ রাখেননি। অল্প কিছু উদাহরণ:

### মক্কায়:

৬১:৭- **যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে;** তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

৭৪:৩১- আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি-যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা **ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে** এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা

সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।

**মদিনায়:**

৪:৬৬- আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, **তবে তারা তা করত না;** অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন| যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে|

৮:৫- যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, **অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না|**

৯:৩৮-৩৯- **হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল,** যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৩৩:১০-১৩- যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং **তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে।** সে সময়ে মুমিনগণ

পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল **তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।** এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।

৪৭:২০-২৩- যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন **যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত** আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিন্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি পদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।

৪৯:১৫- তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি **ঈমান আনার পর সন্দেহ** পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।

## প্রবক্তা মুহাম্মদেরও সন্দেহ

আর প্রবক্তা মুহাম্মদ? তাঁর কী খবর? হ্যাঁ, **মুহাম্মদ নিজেও ছিলেন "সন্দেহভাজনদের একজন”!** ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মাঝে মাঝে তিনি নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতেন।

হারিয়ে ফেলতেন মনোবল। পরক্ষণেই আবার নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিতেন তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে। করতেন স্বগতোক্তি! নিচের আয়াতটি তার সাক্ষ্য হয়ে আছে!

১০:৯৪- সুতরাং **তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক** যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, **তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে।** এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না।

>>> পাঠক, আসুন আমরা ১০:৯৪ আয়াতটিকে একটু মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি। বলা হচ্ছে, **"তুমি** যদি সন্দেহ ভাজন হও তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো"। কাকে জিজ্ঞেস করতে হবে? যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে! অর্থাৎ আহলে কিতাবদের। অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের। **যারা সর্বদাই মুহাম্মদের দাবীকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে এসেছেন।**

অর্থাৎ "আল্লাহ" মুহাম্মদকে পরামর্শ দিচ্ছে, "হে মুহাম্মদ তুমি **যদি** সন্দেহের সম্মুখীন হও তবে **যারা তোমাকে নবী হিসাবে বিশ্বাসই করে না সেই অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞেস করে তুমি যে সত্য নবী এ বিশয়ে সন্দেহ মুক্ত হও!"** পাঠক, কিছু কি বুঝতে পারলেন? বুঝতে না পারলে হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই! Let me try again!

কল্পনা করুন আপনি একজন ধর্মপ্রচারক। আপনার প্রচারণাকে যারা বিশ্বাস করে না। আপনাকে যারা মিথ্যাবাদী-জালিয়াত-পাগল বলে জানে। আপনার মনেও যদি কখনো তাদেরই মত সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবে সে অবস্থায় **আপনি যে সত্যিই একজন**

**"সত্যবাদী" তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদেরকেই জিজ্ঞেস করুন যারা আপনাকে "মিথ্যাবাদী" বলে জানে!**

কী বললেন? **এ তো পাগল প্রলাপ?** পাঠক, আপনারা জ্ঞানী। তাই সমস্যাটা অতি সহজেই ধরতে পেরেছেন। সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত তাফসীর-কার **তানভীর আল-মিক-বাস** (মৃত্যু ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ) সম্ভবতঃ আপনাদের মতই **১০:৯৪**-এর সমস্যাটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই তিনি হয়তো এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে উক্ত আয়াতে **"মুহাম্মদের সন্দেহ"**-এর কোনো আভাস দেয়া হয় নাই! তাঁর মতে, 'উক্ত বাণীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক **'আহলে কিতাবদের সন্দেহের** বিষয়ে আলোকপাত করেছেন! তাঁর মতে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাব অর্থে "ইহুদী-খ্রিষ্টান" কে নয়, 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম' নামক এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন: [1]

"The Prophet (pbuh) did not ask nor was he ever in doubt about the Qur'an. Rather, Allah was addressing with these words the people of the Prophet."

>>> আল্লাহ পাকের এই সহজ সরল (**তুমি যদি** --) বাণীটি যে কী উপায়ে 'আহলে কিতাবের সন্দেহ' রূপে রূপান্তরিত হলো তা মোটেও বোধগম্য নয়। অন্যদিকে **তাফসীরে আল জালা-লীন** (মৃত্যু, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ) কিংবা **তাফসীরে ইবনে কাথির** (১৩০১-১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ) উক্ত আয়াতে 'মুহাম্মদের সন্দেহের' ব্যাপারে কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেন নাই। তাফসীর ইবনে আব্বাসের মত তারা কোনো **"কসরতের"** আশ্রয় নেননি। [2] [3]

সত্য হলো, সেই শুরু থেকেই মুহাম্মদ ও তার বাণীকে সর্বদাই তাঁর পরিপার্শ্বের প্রায় সকল মানুষ **দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান** করে এসেছেন। তারা মুহাম্মদের প্রচারণায় শুধু যে

নতুনত্বের কোনোই সন্ধান পাননি, তাইই নয়, তাঁরা তাঁকে জানতেন এক মিথ্যাবাদী, জালিয়াত(forged Quran), যাদুগ্রস্থ (Bewitched) ও উন্মাদ রূপে। মুহাম্মদ তাদের সেই অভিযোগের কোনো সদুত্তরই দিতে পারেননি। দেখাতে পারেননি তারই প্রচারিত অন্যান্য নবীদের উপাখ্যান সদৃশ কোনো অলৌকিকত্ব (বিস্তারিত আলোচনা করবো মুহাম্মদের মোজেজা তত্বে)। উপর্যুপরি মুহাম্মদ সর্বদায় তার প্রচারণায় কুরাইশ ও তাদের দেবদেবী এবং পূর্বপুরুষদের করতেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। দিতেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি-শাসানি। করতেন ভীতি প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ! ফলাফল, মুহাম্মদের ১৩ বছরের মক্কা প্রচারণায় ফসল অনূর্ধ্ব মাত্র ১৩০ জন অনুসারী।

শুধু কি তাই? মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর (কুরান) পর্যালোচনায় আমরা আরও জেনেছি যে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে যাদেরকে তিনি অনুসারী করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদেরও অনেকেই পুরোপুরি সন্দেহাতীত ছিলেন না। ওপরে বর্ণিত **'মুমিনদের সন্দেহ'** তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

মুহাম্মদ ও তার নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা মদিনায় হিজরত পরবর্তী সময়ের শুরু থেকেই কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে **অনৈতিক সহিংসতার** আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ত্রাসী কায়দায় অমানুষিক নৃশংসতায় বিরুদ্ধবাদীদের করেছেন খুন! উন্মত্ত শক্তি প্রয়োগে বংশ পরম্পরায় বসবাসরত শতশত বছরের জন্মভূমি/আবাসস্থল থেকে তাদেরকে করেছেন উচ্ছেদ। লুট করেছেন তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। তাদেরকে করেছেন বন্দী! ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাদের বউ-বাচ্চা-পরিজনদের! যৌনদাসী বানিয়েছেন তাদের স্ত্রী-কন্যাদের! ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা উপায়ে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা অবিশ্বাসীদের "বিশ্বাসী" হতে **বাধ্য করেছেন।**

**সত্য হলো মুহাম্মদের প্রচারণার শুরু থেকে কোন কালেই মুহাম্মদ সন্দেহাতীত ছিলেন না। এখনও নেই!** আজ ১৪০০ বছর পরে মুহাম্মদের প্রচারিত মতবাদের (Ideology)

ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় তা আরও স্পষ্ট থেকে **স্পষ্টতর** হয়েছে। ইসলাম অনুসারীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা-মর্যাদায় পৃথিবীর সর্বনিম্ন (দুটি ভিডিও, সাকুল্যে ১১ মিনিট: এক, দুই) । তাদের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলোর অন্যতমটি হচ্ছে "ইসলামের মূল শিক্ষা", যাকে সর্বদাই পেশীশক্তি, হুমকি ও মিথ্যার আড়ালে গোপন রাখা হয়েছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা-সমালোচনা, পারিপার্শ্বিকতা ও লব্ধ জ্ঞানের আলোকে সাধারণ মুসলমানেরা সে সত্যকে সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন। প্রয়োজন **শুধুই সদিচ্ছা।**

**সুতরাং, আমরা কুরানেরই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-বিশ্লেষণ ও যুক্তির আলোকে স্পষ্টই জানতে পারছি যে সংকলিত কুরানের বোধগম্য সর্বপ্রথম বাণী "এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই" দাবীটির আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] তাফসীর তানভীর আল-মিক-বাস

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[2] তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=10&tAyahNo=94&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[3] তাফসীর ইবনে কাথির:
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=65#1

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২০: অবিশ্বাসী পরহেযগার ও স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচার তত্ত্ব

সংকলিত কুরানের বোধগম্য সর্বপ্রথম বাণী 'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই' দাবীটির যে আদৌ কোনো ভিত্তি নেই, তার বিশদ আলোচনা আগের তিনটি পর্বে করা হয়েছে। সেই একই বাক্যের পরবর্তী অংশ এবং তার পরের তিনটি বাক্যে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরও দাবী করেছেন:

"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। **পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,** যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং **যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে** এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম (২:২-৫)"

অর্থাৎ, যারা মুহাম্মদ ও তার বাণীকে বিশ্বাস করে তার আদেশ-নিষেধ পালন করবে, তারাই হলেন পরহেযগার! আর, **শুধু** পরহেযগারদের জন্যই এই কিতাবটি 'পথ প্রদর্শনকারী'। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের জন্য কী? কীভাবেই বা তাঁরা অবিশ্বাসী হলেন? তাদের অবিশ্বাসের পেছনে প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? অবিশ্বাসীরা এই কিতাবটি

থেকে কী আশা করতে পারেন? আর কারাই বা এই 'বিশ্বাসী পরহেজগার'? কীভাবেই বা তারা বিশ্বাসী হলেন? এ সকল নানা প্রশ্নের জবাব আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার কল্পিত সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ) উদ্ধৃতি দিয়ে সমগ্র মানুষকুলকে অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে তার দাবীর সার সংক্ষেপ:

১) শয়তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনের মদদদাতা "স্বয়ং আল্লাহ"!

২) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তানের "কিচ্ছু" করার ক্ষমতা নেই!

৩) "স্বয়ং আল্লাহই"অবিশ্বাসীদেরকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করেন!

৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না!

৫) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা"সরল পথে চালান।

৬) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা"পথভ্রষ্ট করেন!

৭) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন!

৮) বিপথগামী করেন "যিনি", শাস্তিও দেবেন "তিনিই"!

৯) আল্লাহর "ইচ্ছা নয়" যে, সবাই সুপথ প্রাপ্ত হোক! কারণ?

১০) কারণ, "তিনি"জিন ও মানবকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

মুহাম্মদ তাঁর জবানবন্দীতে বার বার ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের অবিশ্বাসের পেছনে আল্লাহরই ইচ্ছা জড়িত। অর্থাৎ, মানুষকে বিভ্রান্ত করার পেছনে প্রকৃতপক্ষে যে সত্ত্বাটি দায়ী, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ! শয়তানের কোনোই শক্তি নেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার!

এখন প্রতিটি পয়েন্ট বিশ্লেষণ করা যাক।

## ১) শয়তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনের মদদদাতা "স্বয়ং আল্লাহ"!

মুহাম্মদের ভাষায়:

১৯:৮৩- আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, **আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি।** তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে।

৪১:২৫- **আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম**, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

৪৩:৩৬- যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, **আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই,** অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।

## ২) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তানের "কিচ্ছু" করার ক্ষমতা নেই!

৫৮:১০- এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে **আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।** মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা

>>> শয়তানের যাবতীয় **অপকর্মের** পেছনে যে সৃষ্টিকর্তাই দায়ী, তা কি জগতের কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারেন? এমত দাবীদার ও তার দাবীকে বিশ্বাস করে জগতের কোনো বিবেকবান মানুষই কি হুকুম পালনকারী শয়তানকে ঘৃণিত-অভিশপ্ত এবং তার **গডফাদার** আল্লাহকে নিষ্পাপ-পুত-পবিত্র জ্ঞান করতে পারেন? এহেন উদ্ভট দাবীকে বৈধতা দিতে নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীরা যখন এর চেয়েও বেশী উদ্ভট কু-যুক্তির অবতারণা করেন, তখন আবারও প্রমাণ হয় যে, বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অবশ করে দেয়।

## ৩) “স্বয়ং আল্লাহই” অবিশ্বাসীদেরকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করেন!

মুহাম্মদ আরও ঘোষণা দিয়েছেন:

৪:৮৮- অত:পর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? **আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন,** তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না|

৭:১৮৬- **আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন|** তার কোন পথপ্রদর্শক নেই| আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্তায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন|

১৬:৩৭- আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও **আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন** তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারী ও নেই।

৩০:২৯- বরং যারা যে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খূশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব, **আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন,** তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

**অনুরূপ বাণী: ২:২৬, ৪:১১৫, ১৪:২৭, ৩০:২৯, ৪০:৩৩, ৪২:৪৪, ৪২:৪৬,** ইত্যাদি।

## ৪) "নিশ্চয়ই আল্লাহ" অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না!

প্রবক্তা মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছেন:

৫:৬৭- হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে| আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না| আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন| **নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না|**

৬:১৪৪- অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষন করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? **নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না|**

৬১:৭- যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? **আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।**

**অনুরূপ বাণী: ২:২৫৮, ২:২৬৪, ৭:১৪৬, ২৮:৫০,** ইত্যাদি।

**ইসলামী পরিভাষা**

ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ইসলামী পরিভাষা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতেই হবে। তা না হলে সুবিধাবাদী ইসলামীস্টদের কুরান-হাদিসের উদ্ধৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার গ্যারান্টি শতভাগ! **"অত্যাচারী, জালেম, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী, অসৎ, অভিশপ্ত, অনাচারী, অন্যায়কারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, নির্বোধ, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, মূক ও বধির"** ইত্যাদি যাবতীয় বিশেষণের অর্থ (Meaning) সাধারণ জ্ঞান ও সর্বসম্মত পরিভাষায় যা সর্বজনবিদিত, ইসলামী পরিভাষায় তার অর্থ সম্পূর্ন ভিন্ন! শুধু অমুসলিমরাই নয়, কুরান-সীরাত-হাদিসে অনভিজ্ঞ সাধারণ মুসলিমরা ও এ সকল ইসলামী পরিভাষার কারসাজী খুব সামান্যই অবগত। তারা পদে পদে বিভ্রান্ত হন ইসলামী পরিভাষার এ সকল মারপ্যাঁচে! ইসলামী পণ্ডিতরা সাফল্যের সঙ্গে এ সকল প্রচলিত শব্দ-মালার **'যেখানে যেমন-সেখানে তেমন'**ব্যাখ্যা হাজির করে অমুসলিম ও সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী!

মুহাম্মদের দাবী, 'তিনি বিশ্ব-স্রষ্টার মনোনীত শেষ নবী! তাঁর দাবী, তিনি যা বলেন, তা বিশ্বস্রষ্টারই বাণী। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী - পৃথিবীর সকল মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য হলো মুহাম্মদের (আল্লাহ) বশ্যতা স্বীকার করে **শুধু তারই** হুকুম-আদেশ-নিষেধ তামিল করা! যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুহাম্মদের জবানবন্দীর (কুরান) যে কোনো "একটি" দাবী-আদেশ-নিষেধকে অস্বীকার করবেন, অবাধ্য হবেন, প্রশ্ন তুলবেন, প্রতিরোধ করবেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদেরকেই ওপরোক্ত বিশেষণে আখ্যায়িত করা ইসলামী বিধান। তাঁরাই হলেন **"সেই"** কাফের, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী, জালেম, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী, অসৎ, অভিশপ্ত, অনাচারী, অন্যায়কারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, নির্বোধ,

মূর্খ, মিথ্যাবাদী, মূক ও বধির সম্প্রদায়! বিভ্রান্ত হতে না চাইলে ইসলামের যে কোনো আলোচনায় ইসলামী পরিভাষার এই **"প্রাথমিক পাঠ"** পাঠকদের সর্বদাই সর্বান্তকরণে মনে রাখার অনুরোধ করছি। পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদের **"শায়েস্তা"** করার পূর্ণ ইসলামী তরিকা ('হুমকি-শাসানী, ভীতি-অসম্মান, দোষারোপ, ত্রাস-হত্যা-হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ) মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জবানী গ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে!

## ৫) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা" সরল পথে চালান!

সংকলিত কুরানের সর্বপ্রথম বোধগম্য বাক্যের দ্বিতীয় অংশে মুহাম্মদ (আল্লাহ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এই কিতাব **"শুধু"** পরহেযগারদের জন্যই পথ-প্রদর্শক। কারা এই পরহেযগার? কী যোগ্যতায় তারা 'পরহেযগার' হলেন? মহানবী মুহাম্মদের ঘোষণা, এই পরহেযগারদের "নিযুক্ত করেছেন" স্বয়ং আল্লাহ। কিসের ভিত্তিতে? "ইচ্ছার" ভিত্তিতে! আল্লাহর ইচ্ছা!

২:১৪২- এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই| **তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান|** ৪:৪৯- তুমি কি তাদেকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্ **যাকে ইচ্ছা তাকেই?** বস্তুত: তাদের উপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না| ২২:১৬- এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং **আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা** হেদায়েত করেন।

## ৬) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা"পথভ্রষ্ট করেন!

৬:৩৯- যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির| **আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন** এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন|

১৪:৪- আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর **আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন** এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

৩৫:৮- যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। **নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন** এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।

**অনুরূপ বাণী: ২:১০৫, ২: ২১৩, ২:২৭২, ৬:৮৮, ৬:১২৫, ৭:১৭৮, ১০:১০০, ১৬:৯৩, ১৭:৯৭ , ১৮:১৭, ২৮:৫৬, ৩৯:২৩, ৩৯:৩৬-৩৭,** ইত্যাদি।

## ৭) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন!

শুধু কি তাই? মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।

৫:৪০- তুমি কি জান না যে আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য| **তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন**| আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান|

১৭:৫৪- তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। **তিনি যদি চান,** তোমাদের প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদের আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি।

২৯:২১- **তিনি যাকে ইচ্ছা** শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

**অনুরূপ বাণী: ২:২৮৪, ৩:১২৮-১২৯, ৫:১৮,** ইত্যাদি।

## ৮) আল্লাহর "ইচ্ছা নয়" যে সবাই সুপথ প্রাপ্ত হোক!

৬:১০৭- **যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না|** আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন| ৬:১১২- এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে| তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়| **যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন,** তবে তারা এ কাজ করত না|

১০:৯৯- আর তোমার **পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন,** তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য?

৭৪:৫৫-৫৬- অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। তারা স্মরণ করবে না, **কিন্তু যদি আল্লাহ চান।** তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

**অনুরূপ বানী: ৬:৩৫, ৬:১৩৭, ১৬:৯** ইত্যাদি।

>>> পাঠক, মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করুন! এ সমস্ত বাণী মক্কায় মুহাম্মদের। **"আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি"(৬:১০৭), "তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য?" (১০:৯৯), "যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক"(৭৪:৫৫)** - ইত্যাদি **আপাত সহনশীল** বাণীগুলো "মক্কায়" মুহাম্মদের। যখন তার কোনো শক্তিই ছিল না অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। "মদিনায়" শক্তিমান মুহাম্মদের বাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অবিশ্বাসীদের ওপর তাঁর কল্পিত আল্লাহর 'গজব' তিনি দুনিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন!

## ৯) বিপথগামী করেন "যিনি", শাস্তিও দেবেন "তিনিই"!

মুহাম্মদ ঘোষণা করছেন যে, তাঁর আল্লাহ ইচ্ছা করলেই সবাইকে বিশ্বাসী বানাতে পারতেন! সবাই হত সরল পথপ্রাপ্ত। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি করেন না। কেন? কারণ**, তিনি অবিশ্বাসীদের 'শাস্তি'দিতে চান।** তিনি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন!

৫:৪৯- আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন| অনন্তর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, **আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন|** মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান|

২২:১৮- আবার **অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি।** আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

## ১০) আল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-"তিনি"জিন ও মানবকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন

৩২:১৩-১৪- আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু **আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে**, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। অতএব এ দিবসকে ভূলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। ---

>>> সুতরাং, সংকলিত কুরানের প্রথম বোধগম্য বাক্যটির পরবর্তী অংশের পর্যালোচনায় আমরা জানছি, এই পরহেজগাররা হলেন আল্লাহর **"বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত**"! আর অবিশ্বাসীরা হলেন আল্লাহর **"বিশেষ অভিশপ্ত।"** আল্লাহ এই অভিশপ্ত অবিশ্বাসীদের শুধু যে পথ প্রদর্শন করেন না, তা-ই শুধু নয়; তিনি বিরোধীপক্ষকে শায়েস্তা করার মানসে কুচক্রী মানুষের মত তাদের পেছনে "শয়তান" নিযুক্ত করেন! একনায়ক স্বেচ্ছাচারী

মানুষের মত যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন, যাকে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহবঞ্চিত/অভিশপ্ত! যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা বানান অবিশ্বাসী। যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা চালান বিপথে! যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা দেন শাস্তি। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

অর্থাৎ মুহাম্মদের কল্পিত স্রষ্টা **এক নীতিহীন, কুচক্রী, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্বের আদর্শ রূপ।** স্রষ্টার (যদি থাকে) সাথে মুহাম্মদের এহেন উদ্ভট দাবীর যে আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না, তা যে কোনো সুস্থচিন্তার মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন! ওপরোক্ত দাবী একান্তই মুহাম্মদের। **তারই মনস্তত্ত্বের প্রকৃত চিত্র!** কোনো বিবেকবান সভ্য মানুষই জ্ঞাতসারে এহেন স্বেচ্ছাচারীর সমর্থক হতে পারেন না।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২১: কানে-চোখে-মনে সিলমোহর তত্ত্ব

সংকলিত কুরানের সর্বপ্রথম বোধগম্য প্রথম চারটি (২:২-৫) বাক্যের পরের দু'টি বাক্যেই মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন যে, বিশ্বস্রষ্টা অবিশ্বাসীদের কানে, চোখে ও মনে "সিল-মোহর" মেরে বিশ্বাসী হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেন! বশ্যতা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এই **প্রতিহিংসাপরায়ণ পৈশাচিক কর্মকাণ্ডকে** মুহাম্মদ স্রষ্টার বাণী বলে প্রচার করেছিলেন! মুহাম্মদের ভাষায়:

২:৬-৭– "নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। **আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন।** আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

>>> মুহাম্মদ তার নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দাবি করেছেন বহুবার। অল্প কিছু উদাহরণ:

## ক) স্বয়ং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের "অন্তরে"মারেন মোহর- যেন তারা বুঝতে না পারে!

৪:১৫৫- অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন

যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন| অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে **স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন|** ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

৯:৮৭- তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং **মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর।** বস্তুতঃ তারা বোঝে না।

৩০:৫৯- এমনিভাবে **আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।**

৯:৯৩- অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। **আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে।** বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

৪৭:১৬- তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলেঃ এইমাত্র তিনি কি বললেন? **এদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন** এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

৭:১০০- তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তারাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম| বস্তুত: আমি **মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর|** কাজেই এরা শুনতে পায় না।

**খ) আল্লাহ "অন্তর ও কানে"ভরেন বোঝা - যেন তারা বুঝতে ও শুনতে না পারে!**

৬:২৫- তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের **অন্তরের উপর  আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি।** যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না| এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে: এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী বৈ তো নয়।

১৭:৪৫-৪৬- যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। আমি তাদের **অন্তরের উপর আবরণ** রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের **কর্ণকুহরে বোঝা** চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যায়।

১৮:৫৭- তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের **অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি,** যেন তা না বোঝে এবং তাদের **কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা।** যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না।

**গ) আল্লাহ "অন্তর-কর্ণ-চক্ষুর" ওপর মোহর মেরে করেন সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ!**

১৬:১০৮- এরাই তারা, আল্লাহ তায়ালা এদেরই **অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন** এবং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন।

>>> প্রবক্তা মুহাম্মদ আমাদের আরও জানিয়েছেন যে তাঁর কল্পিত স্রষ্টা অবিশ্বাসীদের অন্তরের ব্যাধি **আরও বৃদ্ধি** করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। তার ভাষায়,

## ১) আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন

২:১০- তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর **আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।** বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।

৬:১১০- আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন-তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং **আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।**

## ২) আল্লাহ প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য সর্দার নিয়োগ করেন!

৬:১২৩- আর এমনিভাবে **আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি-যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে।** তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

## ৩) আল্লাহ শয়তানকে অবিশ্বাসীদের বন্ধু করে দেন!

৭:২৭- হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি-যাতে তাদেরকে লজ্জা স্থান দেখিয়ে দেয়| সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। **আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি**, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

## ৪) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ থেকে বাধা দান করেন!

১৩:৩৩- ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দন্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং **তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে।** আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

## ৫) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করেন!

১৭:১৬- **যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে।** তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।

২৭:৪- যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, **আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি।** অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

## ৬) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করেন!

৪০:৬৩- **এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়**, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।

## ৭) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সাথে কৌশল করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যান!

৬৮:৪৫-৪৫- অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, **আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব** যে, তারা জানতে পারবে না। আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত।

## ৮) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের গোমরাহ করেন

৪:১৪৩- এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত: **যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ করে দেন,** তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।

## ৯) আল্লাহ স্বয়ং ও তার ফেরেশতাকুল অবিশ্বাসীদের অভিসম্পাত করেন!

- বিস্তারিত একাদশ পর্ব অভিশাপ তত্ত্বে।

## ১০) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ধ্বংস কামনা করেন!

৬৩:১-৪- মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। **ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে।** তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?

>>> মুহাম্মদ মানব ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের একজন। আজকের পৃথিবীর ১৬০ কোটি মানুষ জন্মসূত্রে (ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য) তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ/ধর্মের অনুসারী। অথচ এ মানুষটি সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই। কেন? কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী **"বাধ্যতামূলক গুণকীর্তনের"** মাধ্যমে তাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে! মুহাম্মদের যাবতীয় বাণী ও কর্মকাণ্ডকে **ঐশী ও পুত-পবিত্র** রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে নিবেদিতপ্রাণ শত-সহস্র ইসলামী পণ্ডিত গত ১৪০০ বছর যাবত হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা করেছেন, ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে। বোধগম্য কারণেই তাদের লেখাগুলো পক্ষপাতদুষ্ট, একপেশে, অতিরঞ্জিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসত্য। কারণ ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ইসলামবিশ্বাসীই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মের কোনোরূপ সমালোচনা করার "কোনো" অধিকারই রাখেন না। পরোক্ষভাবেও নয়। **সমালোচনার শাস্তি ভয়াবহ, ইসলামী বিধানেই!**

অমুসলিম লেখক/বুদ্ধিজীবীরাও একইভাবে পঙ্গু। শাসক, ক্ষমতাসীন ও নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম অনুসারীর পেশীশক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যাঁতাকলকে অবজ্ঞা করার পরিণতি ভয়াবহ! মুহাম্মদ সময়কালের আবু লাহাব-ক্বাব বিন আশরাফ-আবু রাফি-আসমা বিনতে মারোয়ান (দ্বাদশ পর্ব) থেকে শুরু করে বর্তমানের হুমায়ুন আজাদ-তসলিমা নাসরিন-সালমান রুশদী-আয়ান হারসি আলি ও সাবমিশান (Submission) চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গোগ সহ অসংখ্য উদাহরণকে কি অবজ্ঞা করা যায়? ইসলামী মতবাদের সামান্যতম প্রতিবাদ করে চরম মূল্যের জন্য সদা সন্ত্রস্ত থাকার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? পলিটিকাল কারেক্টনেস (Political correctness) নামের চতুরতার আশ্রয়ে সুবিধাজনক লেখা-বক্তৃতা-বিবৃতি-মন্তব্য-টক শো-এর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে কে যেতে চায়? এ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল **"সত্যের সমাধি"!** এমত পরিস্থিতিতে সত্যকে আবিষ্কার করতে হলে **খুঁড়তে হবে** ইতিহাসের

"কবর"। গত ১৪০০ বছরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার **পক্ষপাতদুষ্ট** লেখা থেকে সত্যকে উদ্ধার অত্যন্ত দুরূহ, গবেষণাধর্মী ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। কিন্তু তা কক্ষনোই অর্থহীন নয়। বিশেষ করে যে মানুষের অনুসারীর সংখ্যা আজকের পৃথিবীর ১৬০ কোটি!

তথাকথিত ঈসা অথবা মুসা কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। এ নামে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে আদৌ ছিলেন কি না, সে ব্যাপারেও পণ্ডিতরা একমত নন। তথাকথিত ঈসার মৃত্যুর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে বাইবেল। তথাকথিত মুসার মৃত্যুর কয়েক শত বছর পর তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে তৌরাত। অন্যদিকে মুহাম্মদ **নিজেই নিজেকে** নবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। স্রষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে রচনা করেছেন কুরান। মানব ইতিহাসের হাজারও নৃশংস ঘটনার নায়কের উত্থান-পতন হয়েছে। তারা মৃত। মুহাম্মদও মৃত। আমার জানা মতে, মুহাম্মদই একমাত্র সফলকাম মানুষ, **যিনি নিজে** তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে **ঐশী, নির্ভুল ও কাল উত্তীর্ণ** বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাঁর মতবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার ও প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাই মুহাম্মদের যাবতীয় অমনাবিক শিক্ষা আজও পালিত হচ্ছে পরম একাগ্রতায়! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। সে কারণেই ঘুরে ফিরে এই মৃত মানুষটিকে নিয়ে এতো আলোচনা-সমালোচনা। তার উপর আক্রোশবশতঃ নয়। আমি মনে করি, মৃত মানুষের উপর জীবিতের কোনোরূপ আক্রোশ থাকা উচিত নয়। কারণ তা অর্থহীন! মৃত মানুষের কোনো কর্মক্ষমতা নেই। সে জাগতিক যাবতীয় ভাল-মন্দ ও আলোচনা-সমালোচনার অতীত। মুহাম্মদ-পরবর্তী ইসলামবিশ্বাসী রাষ্ট্রনায়ক ও অনুসারীদের যাবতীয় অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং মুহাম্মদের যাবতীয় কাজের বৈধতা দানকারী পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ডের জন্য মুহাম্মদকে কি দায়ী করা যায়? দায়ী সেই ব্যক্তিরা, যারা সেই কর্মের সাথে জড়িত। কোনো মৃত ব্যক্তি নয়!

মুহাম্মদ ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এক আরব বেদুইন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে আধুনিক মানুষের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হবেই। এ সহজ সত্যকে অস্বীকার কারে যারা "মুহাম্মদী মতবাদ" সর্বকালের মানুষের জন্য একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনবিধান রূপে প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী হয়ে "মুহাম্মদী কায়দায়" পৃথিবীবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন, তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব সকল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের! এই দায়িত্ব জ্ঞানেই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করার মানসে অগণিত মুক্তমনা আজ কলম ধরেছেন।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যে "সত্যে" আমরা একমত, তা হলো সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকে) বাণীতে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য, ভুল বা মিথ্যা থাকতে পারে না। শুধু **"একটি মাত্র"**ভুল, অবাস্তবতা অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যাবে যে, কুরান 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী হতে পারে না। গত বিশটি পর্বের আলোচনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে, মুহাম্মদের প্রচারিত বাণী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাস্তবতার আলোকে **অসংখ্য অসত্য, মিথ্যা ও অসামঞ্জস্যতায় ভরপুর।** সুতরাং কুরান কোনো অবস্থাতেই স্রষ্টার বাণী হতে পারে না।

প্রতিটি মানুষেরই বচন ও কর্ম সে মানুষটিরই মন-মানসিকতার একান্ত বৈশিষ্ট্য। তা সেই বচন ও কর্ম তিনি ভুত-প্রেত-আত্মা অথবা জীনের উদ্ধৃতি দিয়েই করুন কিংবা করুন সৃষ্টিকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে! সব ক্ষেত্রেই তা তারই নিজস্ব মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। উদ্ধৃত জিন-ভুত-আত্মা বা স্রষ্টার নয়! **কুরানের যাবতীয় বাণী "একান্তই" মুহাম্মদের।** তাই কুরানের বক্তব্যকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণই হলো মুহাম্মদ ও তাঁর মানসিকতাকে আবিষ্কারের সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে কম শ্রমসাধ্য পদ্ধতি। গত দু'টি পর্বের আলোচনায় আমরা যে সত্যটি আবিষ্কার করলাম, তা হলো কুরানের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে রূপায়িত করেছেন এক

**পক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী, প্রতিহিংসা পরায়ণ, নীতিহীন, স্বেচ্ছাচারী রূপে!** মুহাম্মদ তাঁর জবান-বন্দীতে (কুরানে) অসংখ্যবার ঘোষণা দিয়েছেন যে তার আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা অবিশ্বাসী বানান! যাকে ইচ্ছা করেন সুপথগামী, যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী। যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা, প্রবেশ করান জান্নাতে! যাকে ইচ্ছা দেন শাস্তি, টেনে-হেঁচড়ে নিক্ষেপ করেন জাহান্নামের অনন্ত আগুন ও রক্ত-পুঁজের সমুদ্রে! তিনি অবিশ্বাসীদের পেছনে লেলিয়ে দেন শয়তানকে, যেন শয়তান তাদেরকে করে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট! এহেন কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানবতার যে কোন মানদণ্ডে **কুৎসিত, অনৈতিক ও গর্হিত!**

এই অনন্ত মহাবিশ্বের আদৌ কোন স্রষ্টা আছে, এমন কোনো **প্রমাণ নেই।** এর পরেও যাঁরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা কি তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে কখনোই পক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী, নীতিহীন, স্বেচ্ছাচারী রূপে কল্পনা করতে পারেন? কক্ষনোই নয়! উপরি উক্ত দাবি একান্তই মুহাম্মদের। কোনো সুস্থ বিবেকবান মুক্তবুদ্ধির সভ্য মানুষ কখনোই কোনো পক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী, নীতিহীনের সমর্থক হতে পারেন না।

পাঠক, আগেই বলেছি; আমার এ লেখা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উচিত নাকি অনুচিত, প্রয়োজন নাকি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক নাকি লাভজনক, সে প্রসঙ্গেও নয়। সমগ্র আলোচনার উদ্দেশ্য- স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিজেরই জবানবন্দী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর দাবীর যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণ! তাঁর সত্যিকারের জীবনী ও মানসিকতা নিরূপণ! মনোযোগী হয়ে কুরান পড়ুন এবং সত্যকে জানুন।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২২: নো সেন্স ও ননসেন্স (অর্থহীন আগড়ম বাগড়ম) তত্ত্ব
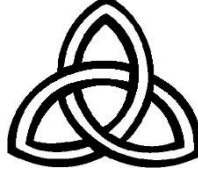
কুরানের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর কল্পিত আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান কোনো মন্দ কাজ করতে পারে না। তিনি দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহ **অবিশ্বাসীদেরকে** সরল পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদেরকে বিপথগামী করার জন্য আল্লাহ শয়তান নিযুক্ত করেন। তাঁর দাবি, 'আল্লাহ' অবিশ্বাসীদের অন্তরের পাপ বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের মন, কান ও চোখে পর্দা ঢেলে দেন, যাতে তাঁরা পথ-প্রাপ্ত বিশ্বাসী হতে না পারেন। প্রবক্তা আরও ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর ফেরেশতা অবিশ্বাসীদের অভিশাপ দেন। এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে অবিশ্বাসীরা যে কোনোভাবেই 'পথ-প্রাপ্ত' হতে পারেন, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তাহলে? অবিশ্বাসীরা কীভাবে পরহেজগার হবেন?

যেখানে 'আল্লাহ' স্বয়ং এবং তাঁর সমস্ত বাহিনী (শয়তান এবং ফেরেস্তাগন) অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী হবার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, সেখানে 'অবিশ্বাসীরা' ঠিক **কী অপরাধে অপরাধী** তা সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির অতীত (নো সেন্স)! এহেন পরিস্থিতিতে অবিশ্বাসীরা কোনো অপরাধেই অপরাধী হতে পারেন না। এই সহজ সত্যটি বিশ্বাসীরা কখনোই বুঝতে পারেন না। যতই তাঁরা "স্বাধীন-ইচ্ছা (Free Will)"-এর দোহায় দিয়ে ত্যানা-প্যাঁচানো যুক্তির অবতারণা করেন, ততই তাঁরা নিজেকে হাস্যকর প্রতিপাদ্য

করেন। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর বাহিনীর বাধার মুখেও যদি কোনো মানুষ তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগে বিশ্বাসী হতে পারেন, তবে কুরানে মুহাম্মদ বর্ণিত আল্লাহর যাবতীয় শক্তিমত্তার জয়গান ও জারিজুরি **স্রেফ তামাশা!** আর যদি আল্লাহর অসীম **ক্ষমতার অপব্যবহারে** (বান্দাকে বিপথে পরিচালনা) অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীই থেকে যান, তবে তার সমস্ত দায়ভার স্বয়ং আল্লাহর! মানুষের নয়!

যদি সৃষ্টিকর্তা মানুষকে **স্বাধীন ইচ্ছার** অধিকারী করেন। আর সেই স্বাধীন ইচ্ছাটি প্রয়োগ করে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর তথাকথিত আদেশ নিষেধের কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে না পেয়ে অবিশ্বাসী হন, আর সেই অবাধ্যতার কারণে সৃষ্টিকর্তা যদি সেই মানুষটিকে আগুনে পোড়ানোর ঘোষণা দেন, তবে সে "ইচ্ছা" কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অসহায় কোনো মানুষের মাথায় বন্দুকের নল দাগিয়ে কেউ যদি তাকে সর্বশক্তিমান দয়ালু বলে মানার হুংকার দেন, আর তা না করলে উক্ত বন্দুকধারী যদি সেই অসহায় মানুষটিকে গুলি করে খুন করার হুমকি দিয়ে বলেন, "সিদ্ধান্তটা তোর স্বাধীন ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দিলাম। আমাকে মানবি কি মানবি না, তা তোর ইচ্ছা!", তাহলে তা হবে যেমন অতীব হাস্যকর, তার চেয়েও বেশি হাস্যকর অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ বর্ষণ ও বিপথে পরিচালনা করে তাদেরকেই আবার বশ্যতা স্বীকারের আদেশ, অন্যথায় অনন্তকাল আগুনে পোড়ানোর হুমকি! বেশি হাস্যকর এ কারণে যে, বন্দুকধারীটি সন্ত্রাসী হতে পারেন কিন্তু **'ভণ্ড'** নন। আল্লাহর মত সে সেই অসহায় ব্যক্তিটিকে 'বিপথে'পরিচালনা করেননি।

অন্য দিকে মুহাম্মদের ঘোষণা, পরহেজগারদের পরহেজগারির পিছনে আল্লাহরই অনুগ্রহ জড়িত। আল্লাহই তাঁদেরকে **বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে** করেছেন হেদায়েত প্রাপ্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসী হবার পেছনে পরহেজগারির আদৌ **কোনো কৃতিত্ব নাই।** সম্পূর্ণ কৃতিত্বই আল্লাহর! এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পরহেজগারদের পুরস্কৃত করবেন। বিনা কৃতিত্বেই অনন্ত

পুরষ্কার! কারণ? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা অবিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। সুতরাং, মুহাম্মদের দাবির পর্যালোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হলো: তাঁর কল্পিত আল্লাহ, **অবিশ্বাসীদের বিনা দোষেই অনন্ত শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের বিনা কৃতিত্বেই অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি দেন**। Any sense? No sense!

প্রবক্তা মুহাম্মদ নিজেকে অভ্রান্ত দাবি করে তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে সুরা প্রতিযোগিতার আহ্বান **(পর্ব-১৯)** ছাড়াও আর যে সকল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুহাম্মদেরই ভাষায় তারই অল্প কিছু উদাহরণ:

## ১) "তবে"মৃত্যু কামনা/বরণ করে প্রমাণ কর যে তুমি সত্যবাদী!

২:৯৪- বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে - অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, **তবে মৃত্যু কামনা কর**, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

>>> অদ্ভুত প্রস্তাবনা! মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, মরণোত্তর জীবন বলে আদৌ কিছু আছে, তথাপি কোনো মৃত ব্যক্তি মরণের ওপার থেকে জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করে **"রাজসাক্ষী"** হতে পারে না। তাই মৃত্যুকামনা বা মৃত্যুবরণের মাধ্যমে সত্যতার যাচাইয়ের কোনো প্রশ্নই আসে না! এই একই "প্রস্তাবনা" যদি প্রবক্তা মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীদের দেওয়া হয়, তাহলে কি তাঁরা মৃত্যুকামনা/মৃত্যুবরণ করে অবিশ্বাসীদের প্রমাণ দেবেন যে, তাঁরা সত্যবাদী? এমনতর দাবি একেবারেই ননসেন্স (অর্থহীন আগড়ম বাগড়ম)!

## ২) "তারা" তোমাদের কষ্ট দুর করতে অক্ষম!

১৭:৫৬- বলুনঃ আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর। অথচ **ওরা তো তোমাদের কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে না** এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না।

>>> মুহাম্মদের "আল্লাহ" যে ইসলাম বিশ্বাসীর কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? ইসলাম বিশ্বাসীরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বনিম্ন!

## ৩) "তারা" কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে না!

২২:৭৩ - হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, **তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না,** যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। **আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না,** প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।

>>> মুহাম্মদের "আল্লাহ" যদি অবিশ্বাসীদের সামনে এসে একটি মাছি সৃষ্টি করে তার অস্তিত্বের প্রমাণ হাজির করে দেখাতেন, আর সেই মাছিটি যদি কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে "আল্লাহ" যদি তা নিজেই উদ্ধার করে অবিশ্বাসীদের দেখাতেন, তাহলেই শুধু এ বাণীর "সেন্স" থাকতো! নতুবা এমনতর দাবি "ননসেন্স"!

## ৪) "তোমাদের" দেব-দেবীকে "আমার" সামনে হাজির কর!

৩৪:২৭- বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, **তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও।** বরং তিনিই আল্লাহ, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

৬৪:৪১- না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে **তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক** যদি তারা সত্যবাদী হয়।

>>> মুহাম্মদ কখনোই তার আল্লাহকে অবিশ্বাসীদের সামনে হাজির করে তার দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেননি! তাই অবিশ্বাসীদের প্রতি তার এ চ্যালেঞ্জ একেবারেই ননসেন্স!

## ৫) "দেখাও"তোমাদের দেব-দেবী পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে?

৪৬:৪- বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? **দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে?** অথবা নভোমন্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

>>> একেবারেই ননসেন্স!

## ৬) "তারা" তাদেরকে সাহায্য করল না কেন?

৪৬:২৮- অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, **তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন?** বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়।

>>> সেই সনাতন প্যাচাল! এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীকে বলে, **"আমি সত্য, তুমি মিথ্যা।"** একে অপরকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে, 'দেখাও প্রমাণ'। পাঠক, বুঝতেই পারছেন

আল্লাহর "লেবাসে" মুহাম্মদও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিজ নিজ বিশ্বাসের স্রষ্টা/উপাস্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ করার প্রয়োজনে যুগে যুগে মানুষ 'নো সেন্স (অর্থহীন)' কুযুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদের যুক্তিগুলো 'নো সেন্স' পর্যায়ের ছিল না। ছিল **"ননসেন্স"** পর্যায়ের। কারণ যে কর্ম তিনি নিজে করে দেখাতে পারেননি, তাইই তিনি দাবি করেছেন তার প্রতিপক্ষের কাছে!

অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের সত্যতার প্রমান দাবি করেছিলেন। হাজির করতে বলেছিলেন মুহাম্মদেরই দাবিকৃত পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ একটি প্রমাণ। প্রত্যুত্তরে মুহাম্মদ তাদের কী জবাব দিয়েছিলেন, তার বিশদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। বিস্তারিত আলোচনা করবো **'মুহাম্মদের মোজেজা'** তত্ত্বে।

**এ ছাড়াও মুহাম্মদের (আল্লাহ) বর্ণিত আরও কিছু "নো সেন্স ও ননসেন্স" এর উদাহরণ:**

## ৭) তোমাদের জন্যে পুত্র-সন্তান আর "আল্লাহর" জন্য কন্যা-সন্তান - কী সাংঘাতিক?

১৭:৪০- তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা **গুরুতর গর্হিত** কথাবার্তা বলছ।

১৯:৮৮-৯১- তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয় তো **এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।** এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে।

>>> অবিশ্বাসীদের ধারনা আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহর) কাছে এটা এতটাই গর্হিত অপরাধ যে, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, "এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।" মুহাম্মদ (আল্লাহ) তার অংশীদার অথবা সন্তান ধারণ সংক্রান্ত মন্তব্যকে এত বেশি অপছন্দ করেন যে, তার অপরাধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চান! কেন? একমাত্র নপুংসক ছাড়া এমন মন্তব্যে আর কি কেউ এতটা উত্তেজিত হয়? মানুষের জন্যে পুত্রসন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান এটা কি খুবই গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা?

## ৯) "আশঙ্কা হেতু" শিশুহত্যায় কোনোই অপরাধ নাই!

১৮:৭৪- অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, **তখন তিনি (খিজির আঃ) তাকে হত্যা করলেন।** মূসা বললেন? আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

>>> কেন শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছিল? কারণ,

১৮:৮০- বালকটির ব্যাপার তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। **আমি আশঙ্কা করলাম** যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।

>>> হ্যাঁ, তাই! খিজির (আ:) **"আশঙ্কা"** করেছিলেন যে শিশুটি বড় হয়ে তার ইমানদার পিতা-মাতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই তিনি শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন সুস্থ মস্তিষ্কে! তিনি কি কোনো গর্হিত অপরাধ করেছিলেন? প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহর) দৃষ্টিতে, "অবশ্যই নয়।" কী মহান শিক্ষা!

## ১০) অবিশ্বাসীদের জীবিকা হয় সংকীর্ণ!

২০:১২৪- যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, **তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে** এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।

>>> বাস্তবতা ঠিক তার বিপরীত! অবিশ্বাসীরাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থপ্রাচুর্য, ক্ষমতা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে মুসলিমদের তুলনায় অনেক অনেক ওপরে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পঞ্চদশ পর্বে করা হয়েছে।

## ১১) সুদের (লাভ) প্রলোভন দেখিয়ে আল্লাহর "ধার ভিক্ষা"!

২:২৪৫- এমন কে আছে যে, **আল্লাহকে করজ দেবে,** উত্তম করজ; অত:পর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ্ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

৫৭:১১- কে সেই ব্যক্তি, যে **আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে,** এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

৫৭:১৮- নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, **যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়,** তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

>>> এমন কোনো পরমোৎকৃষ্ট (Superlative) বিশেষণ নেই, যা মুহাম্মদ তাঁর কল্পিত আল্লাহর ওপর প্রয়োগ করেননি। সেই সত্ত্বাটিকেই যখন দেখি সামান্য মানুষের কাছে সুদের প্রলোভন দেখিয়ে ধার ভিক্ষা করছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অভাবটা

আসলে কার! কোন অভাব হীন স্বত্বা মানুষকে সুদের প্রলোভন দেখিয়ে ধার ভিক্ষা কেন চাইবে? আর কেউ যদি সে ধার ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি কিংবা গড়িমসি করে তবে কেনই বা সেই স্বত্বা মানুষকে শাস্তির হুমকি দেখাবে? ধার-চাঁদা-সাহায্য বিষয়গুলি **ঐচ্ছিক।** দাতা তা দিবেন কি দিবেন না তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। চাহিদাকারী যদি 'ধার' দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে 'হুমকি' দিয়ে ধার দিতে বাধ্য করান তবে তা আর 'ধার' থাকে না। হয় **জবরদস্তি!** যদি কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের কাছে 'চাঁদা বা সাহায্য' চাইবার পর তা না দেওয়া হলে তিনি দাতাটিকে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেন তবে তার নাম হয় চাঁদাবাজি বা মাস্তানি। আর সেই চাহিদাকারীকে বলা হয় মাস্তান বা সন্ত্রাসী।সত্য হলো স্রষ্টার (যদি থাকে) কোন ধার-কর্জের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রবক্তা **মুহাম্মদ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সাহায্যের প্রয়োজন তারই। ক্ষমতার প্রয়োজন তারই। তোষামোদের প্রয়োজন তারই। তার অবাধ্যতা কারীকে হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন-প্রলোভন ইত্যাদি কৌশলে অনুগত করার প্রয়োজন তারই।**

## ১২) মৃতরাও জীবিত!

২:১৫৪- আর **যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত,** কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

>>> মৃত মানুষকে "মৃত" না বলে কীভাবে জীবিত বলা যাবে?

## ১৩) অঙ্গীকারাবদ্ধ! কবে? কিসের?

৭:১৭২-১৭৩- আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি

কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। **আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল** আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে?

>>> "এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না" - কথাটি কি মিথ্যা? তথাকথিত অঙ্গীকারের বিষয় কি কেউ স্মরণ করতে পারেন? আর "অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল" বাণীটি কি অসত্য? পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মকেই অকাট্য জ্ঞানে অনুসরণ করে। ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

## ১৪) শাস্তি না পরীক্ষা?

২:১৫৫- **অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব** কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।

১১:১১৭- আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, **জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন,** সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।

>>> অত্যন্ত অসার বক্তব্য। ভাল কিছু ঘটলে বলা যাবে, 'আল্লাহ পুরস্কৃত করছে।' খারাপ কিছু ঘটলে বলা যাবে, 'আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছে।'এ দুইয়ের যে কোনো একটি নিয়েই জীবন। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনাদিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে ও থাকবে। যদি বিপর্যয়ের **কবলে পড়েন**, তবে বলা যাবে, সেখানকার লোকেরা সৎ কর্মশীল ছিলেন না। যদি দুর্ঘটনার কবলে **না পড়েন,** তবে বলা যাবে, সেখানকার লেকেরা সৎ কর্মশীল

ছিলেন, তাই দুর্ঘটনাটি হয়নি। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই যে, কোনো জনপদের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা বিপথগামী (অসম্ভব প্রস্তাবনা) হবার কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়েছে, সে কারণেই কি সম্পূর্ণ জনবসতি ধ্বংস করা ন্যায়সঙ্গত? শাস্তি হতে হবে শুধু যে অপরাধী, শুধু তারই। কী অপরাধ সে জনপদের শিশুদের? তারা তো কোনো অপরাধ করেনি। কী অপরাধে তাদেরকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে? ২০০৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভয়াবহ সুনামিতে ২২৫,০০০ মানুষের নৃশংস মৃত্যু হয়েছিল। হাজার হাজার শিশু ও গর্ভবতী মহিলারাও ছিলেন সে নিষ্ঠুরতার শিকার। সমষ্টিগত শাস্তি (Collective Punishment) যে কোনো সভ্য সমাজে গুরুতর অপরাধ। একমাত্র বিবেকহীন সাইকোপ্যাথের পক্ষেই এমন নিষ্ঠুরতা সম্ভব।

## ১৫) যদি সমুদ্রের পানি হয় কালি আর পৃথিবীতে সমস্ত বৃক্ষ হয় কলম!

১৮:১০৯- বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে **আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যা**বে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

৩১:১২৭- পৃথিবীতে যত **বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয়** এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

>>> **"কুরানের অ্যানাটমি**"পর্বে আমরা জেনেছি যে, **সমগ্র কুরানের এক-তৃতীয়াংশ হুমকি-শাসানি-ত্রাস অথবা পুরাকালের নবীদের গল্প।** এ ছাড়াও কুরানের বিশেষত্বের একটি হলো **'পুনরাবৃত্তি।'** কুরানে মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের গল্প ২১ বার, নূহের (আঃ) গল্প ১২ বার, ইবরাহিম (আঃ) এর গল্প ১২ বার, লূত (আঃ) এর গল্প ৯ বার, আ'দের

গল্প ৮ বার, সালেহ ও সামুদের গল্প ৭ বার, আদম হাওয়া ও ইবলিস ও দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) - এদের প্রত্যেকের গল্প ৫ বার বলা হয়েছে। এমন একটি বইয়ে যখন ওপরিউক্ত বাণী লেখা থাকে, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, বক্তা হয় বিকারগ্রস্ত অথবা অতীব ধুরন্ধর ও চাপাবাজ! কারণ, "পালন কর্তার" বিষয়ে এত্ত কিছু লিখা অবশিষ্ট রেখে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লেখকই পুরাকালের উপকথা, ঘৃণা, হুমকি, শাসানী, অভিশাপ, কসম, আর অসংখ্য পুনরাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে তার গ্রন্থের সিংহভাগ ভরাট করতেন না। সাত সমুদ্রের পানি কালি এবং সমস্ত বৃক্ষ কলম হলে সে গ্রন্থে লেখক/কথক মশাই মুসা-ফেরাউন-নূহ-ইবরাহিম-লূত-আ'দ-সালেহ-সামুদ-দাউদ-সোলায়মান-আদম-হাওয়া-ইবলিসের গল্প যে কতবার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং কি বিশাল পরিমান হুমকি-শাসানী-হত্যা-হামলা-ঘৃণা বর্ষণ করতেন তা পাঠকের কল্পনার উপরই ছেড়ে দিলাম!

## ১৬) সাফা ও মারওয়ার বৈশিষ্ট্য!

২:১৫৮- **নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম।** সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মুল্য দেবেন।

>>> কিসের মাপকাঠিতে সাফা ও মারওয়া 'নিদর্শন গুলোর অন্যতম'? সাফা ও মারওয়ার কী এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য পাহাড়ে নেই? লেখক/কথক সাহেব সে "নিদর্শনের" সামান্যতম আভাসও দেননি!

## ১৭) ইচ্ছা আছে সাধ্য নাই নাকি সাধ্য আছে ইচ্ছা নাই?

১১:১১৮- আর তোমার পালনকর্তা যদি **ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন** আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না।

৩২:১৩- আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, **আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।**

>>> মুহাম্মদের দাবি, তাঁর আল্লাহ প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি জিন ও মানবকে দিয়ে **অবশ্যই** জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ কিছু মানুষ ও জিনকে তৈরিই করা হয়েছে জাহান্নাম পূর্ণ করানোর জন্যে! কী সাংঘাতিক দাবি! অনেকেই এ বাণীটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলতে চান, "যেহেতু আল্লাহ **সবজান্তা,** তাই তিনি আগে থেকেই কে বেহেশতে যাবেন, আর কে জাহান্নামে যাবেন তা জানেন। আর জানেন বলেই তা আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। তাঁরা দাবি করেন, আল্লাহ কখনোই কোনো মানুষেরই 'স্বাধীন ইচ্ছায়' বাধা দেন না.....।" তাঁদের এ ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রবক্তা মুহাম্মদ অসংখ্যবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর আল্লাহ **যাকে ইচ্ছা** সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন,যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং তিনি অবিশ্বাসীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহ অবিশ্বাসীদের করেন **অভিশাপ** এবং মন-কান-চোখে সিল মেরে করেন সরল পথ-প্রাপ্তিতে সক্রিয় **বাধা প্রধান।** শুধু তাইই নয়, পরবর্তীতে আমরা আরও জানবো যে, তাঁর আল্লাহ স্বর্গ থেকে তার ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে অবিশ্বাসীদের "খুন"ও করেন। তাই, ঐ সব সুবিধাবাদী ব্যাখ্যাকারীর এহেন ব্যাখ্যার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।

## ১৮) মৃতদের "জিজ্ঞেস করুন"!

৪৩:৪৫- **আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন,** দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে?

>>> মুহাম্মদের পূর্বে যেসব রসূলের আগমন হয়েছিল, তাঁরা সবাই তার সময়ের অনেক অনেক বছর আগেই **মৃত্যুবরণ** করেছিলেন। মৃত মানুষদের কি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা যায়? আর জিজ্ঞেস করলেই কি মৃতরা কোনো জবাব দিতে পারেন? অবশ্য ভয়ংকর (Psychotic) মানসিক রুগীরা মৃতদের কথা শোনেন, তাঁদের সাথে কথাও বলেন! আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় তাদের স্থান মানসিক হাসপাতালের তালাবন্ধ কক্ষে, চিকিৎসার প্রয়োজনে!

## ১৯) নুহের নৌকা!

১১:৪০- অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, **আমি বললাম: সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে** এবং যাদের উপরে পূর্বহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, **আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণ কে নৌকায় তুলে নিন।** বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।

>>> সঙ্গত কারণেই (বিস্তারিত নিচে) তৌরাত ও বাইবেলের অন্যান্য গল্পের মত **নুহের নৌকার এ গল্পটিরও** পূর্ণ বিবরণ কুরানে অনুপস্থিত। পূর্ণ বিবরণ আছে বাইবেলের জেনেসিস: চ্যপ্টার ৬-৯-এ। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় **১৭ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আছে।** এদের কয়টিকে নৌকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল? বলা হচ্ছে **'সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি'**করে। অর্থাৎ তিন তলা ডেক ও নিচের কুঠরী বিশিষ্ট ৩০০ কিউবিট (হাত) দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রশস্ত এবং ৩০ হাত উচ্চতার নৌকায় লক্ষাধিক প্রজাতির প্রাণীর জোড়ায় জোড়ায় স্থান সংকুলান যে কী পরিমাণ অবাস্তব, তা যে কোনো সুস্থ চিন্তার পাঠক

অনায়াসেই বুঝতে পারেন। এ বিষয়ে ধর্মকারীতে বিভিন্ন সময়ে অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও (সাকুল্যে ৮ মিনিট) প্রকাশিত হয়েছে।

[কনুই থেকে মধ্যমাঙ্গুলির অর্গভাগ পর্যন্ত এক কিউবিট (হাত)= প্রায় ১৮ ইঞ্চি]।

## ২০) এ সত্যগ্রন্থ পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী!

৫:৪৮- **আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী** এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু **এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন।** অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

## ২১) অন্যান্য

এ ছাড়াও মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনীগ্রন্থের পাতায় পাতায় যে অসংখ্য 'নো সেন্স ও ননসেন্স' বাণী আছে, তার অল্প কিছু উদাহরণ প্রথম (আকাশ তত্ত্ব), দ্বিতীয় (আকাশ ও পৃথিবী তত্ত্ব), তৃতীয় (ভূ-তত্ত্ব), চতুর্থ (মানব-তত্ত্ব), পঞ্চম (দেহ-তত্ত্ব), ষষ্ঠ (ভ্রূণ-তত্ত্ব), সপ্তম (গোবর-তত্ত্ব) ও ত্রয়োদশ (উদ্ভট তত্ত্ব) পর্বে আলোচিত হয়েছে।

>>> পাঠক, আসুন আমরা ৫:৪৮ বাণীটিকে মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি। এ বাণীটির প্রথম অংশে বলা হচ্ছে, "(কুরান) সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের

সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"মুহাম্মদের এই উদ্ধৃতিটি তাঁর সময়ের মত আজকেও **সর্বাধিক ব্যবহৃত** হয়! বিশেষ করে কোনো ইহুদী/ খ্রিষ্টানদের সাথে আলাপ ও বিতণ্ডার সময়। এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে ইসলাম বিশ্বাসীরা প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম এবং তার প্রবর্তক মুসা ও ঈসাকে সমর্থন করেন। আসলেই কি ব্যাপারটা তাই? কুরান সাক্ষ্য দেয় যে, অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে রচিত গল্প-কাহিনীর প্রচারকে **'জালিয়াতি'** (Forgery) আখ্যা" দিয়েছিলেন। বারবারই তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, মুহাম্মদের এ গল্পগুলোর আদি উৎস তাঁদের ধর্মগ্রন্থে রচিত গল্প-কাহিনী ও পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ আর কিছুই নয়। আমরা এও জানি যে, মুহাম্মদের সময় মক্কায় **'ওকাজ মেলায়'** বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা এসে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর করতো, তাদের ধর্মের গুণগান জনগণকে অভিহিত করাতো। মুহাম্মদ বেশ কয়েকবার তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও **অন্যত্র ভ্রমণ** করেছিলেন, যেখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাম্বলী। সেখান থেকে মুহাম্মদ তাদের ধর্মের গল্প-গাঁথা শোনেননি, এমনটি ভাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু **অন্ধ-বধির কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন না।** পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মতই শিশু, শৈশব, কৈশোর ও যৌবনসহ সুদীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি ধর্মজ্ঞান আহরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত বিদুষী ধনাঢ্য খাদিজাকে বিয়ে করার পর নিজ স্ত্রী খাদিজা, খাদিজার চাচাতো ভাই **ওয়রাকা বিন নওফল** (বাইবেলে বিশেষজ্ঞ ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান) ও অন্যান্যের কাছ থেকেও তিনি বিবিধ ধর্মবিষয়ে জ্ঞানার্জনের সময় পেয়েছেন **নিরবচ্ছিন্ন ১৫ টি বছর** (৬৯৫-৭১০ সাল) । তাই মুহাম্মদের প্রচারযন্ত্রে সেই সব ধর্মের গল্প-গাঁথার বর্ণনা থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হলো, মুহাম্মদ যখন এই সত্যটিকে **অস্বীকার** করে প্রচার করতে

শুরু করলেন যে, তার বাণীর উৎস ঐশ্বরিক। বাণী ঐশ্বরিক হলে কেন তিনি পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থগুলোরই বাণী এবং পুরাকালের উপকথাগুলোই ইনিয়ে-বিনিয়ে "ঐশী প্রাপ্ত" আখ্যা দিয়ে নিজের নামে প্রচার করছেন? এমনতর অভিযোগের জবাবেই আত্মপক্ষ সমর্থনে মুহাম্মদকে বলতে হয়েছিল, **"যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী।"** এর পরেও সমস্যার শেষ হয়নি। মুহাম্মদের প্রচার ও আদি গ্রন্থের গল্প ও শিক্ষার মধ্যে যখনই কোনো **'ব্যতিক্রম/গরমিল'** হয়েছে, তখন অবিশ্বাসীরা আবার প্রতিবাদ করেছে, "পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হলে তোমার প্রচার ও আমাদের গ্রন্থের বর্ণনা ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কেন? সত্যায়নকারী গ্রন্থে (কুরান) কী কারণে এত গরমিল?" এমনতর গুরুতর অভিযোগের জবাবে মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে জবাব দিয়েছিলেন যে, "তারা তাদের কিতাব বিকৃত করেছে।"

**বিচার মানি, তবে তাল গাছ আমার- প্রবাদটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো প্রবক্তা মুহাম্মদের এই ঘোষণাটি।** মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন, তিনি শুধু সঠিকই নন, তাদের সে বিকৃত বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারীও।

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সাথে মুহাম্মদের বাণীর (কুরান) পার্থক্য হওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত মুহাম্মদ বিভিন্ন উৎস থেকে যে-ধর্মজ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা ছিল মুখে-মুখে ও শুনে শুনে। লিখতে-পড়তে না জানার কারণে তৌরাত-বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার **পুঙ্খানুপুঙ্খ** বিবরণের অধিকাংশই ছিল তাঁর অজানা। তাছাড়া **স্মৃতি যত প্রখরই হোক না কেন, তা কখনোই শতভাগ শুদ্ধ নয়।** বিচার তাঁকে মানতেই হবে। কারণ তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোরই অনুকরণ। আর তাল গাছ তাকে পেতেই হবে। কারণ তা না হলে "এতো আয়োজন" কিসের জন্য! তাই প্রবক্তার এই বাণীটি দিয়ে যারা প্রমাণ করতে চান যে, ইসলাম ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো ধর্ম বা ধর্মপ্রচারককে বৈধতা দিয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে

ভ্রান্ত। **ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র সত্য হলো "মুহাম্মদ এবং তার বাণী (কুরান)।" বাকি সমস্তই "ইসলামী রাজনীতি।"**

দ্বিতীয় অংশে বলা হচ্ছে, "...কিন্তু এরূপ করেননি- যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন।" **কিসের পরীক্ষা?** পাঠক, আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার পরিপার্শ্বে তাকিয়ে দেখুন তো, ক'জন লোক স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন? আপনি যে বয়সেরই হন না কেন, মনে করে দেখুন তো, এমন 'ধর্মান্তরিত' ক'জন লোককে আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন? আপনার জবাবের সাথেই উক্ত বাণীর অসারতা জড়িত। জোর জবরদস্তিহীন স্বার্থবহির্ভূত স্বাভাবিক পরিবেশে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এটাই যদি বাস্তবতা হয়, তবে মুসলমানদেরকে মনোনীত ধর্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়ে অত্যন্ত **সহজ পরীক্ষা** এবং অবিশ্বাসীদের অমনোনীত ধর্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়ে অত্যন্ত **কঠোর পরীক্ষার** গল্প অবাস্তব ও অযৌক্তিক। এই বাণীটি অমুসলিমদের বিশ্বাস নিয়ে রসিকতা বৈ আর কিছুই নয়।

একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, ৯৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ পরিবৃত দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের আদৌ কিনা সৃষ্টিকর্তা আছেন, এমন প্রমাণ কখনোই ছিল না, আজও নেই। মুহাম্মদ তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে যে স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁরই নিজস্ব মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ! প্রকৃতির কাছে অসহায় এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি 'কল্পনার' ঈশ্বরকে নিয়ে অনেক বাণিজ্য স্বঘোষিত নবী, অবতার এবং তাঁর সংঘবদ্ধ চেলারা যুগে যুগে করে এসেছেন। এখনো করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কারণ এ বাণিজ্যে শুধুই লাভ। কোনোই লোকসান নেই। এ ব্যবসার পুঁজি হচ্ছে মানুষের **অসহায়ত্ব ও অজ্ঞানতা।** যা চিরকাল আছে এবং থাকবে। স্বঘোষিত নবী ও অবতাররা অসহায়

মানুষের সেই কল্পিত ঈশ্বরকে তাদের নিজেদেরই মনের মাধুরী মিশায়ে শ্লোক রচনা করে নাম দিয়েছেন **ধর্মগ্রন্থ।** তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা-ধারাকে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়েছেন অসহায় বোকা সাধারণ জনগণকে **নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে।** শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায়। তাই ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরপক্ষপাতদুষ্ট সেই সব মানুষেরই প্রতিনিধিত্বকারী "মানুষ-ঈশ্বর।"তাঁদের সে ভুয়া ঈশ্বর এতটাই হাস্যকর যে, সেই ঈশ্বরকে ১৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে 'সেই স্পেশাল নবী/অবতারকে পৃথিবী নামক অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানে জন্মানোর অপেক্ষায়, ধর্মপ্রচার ও ধর্মগ্রন্থ লেখার অপেক্ষায়! সে রকম এক বা একাধিক মানুষের রচিত কেতাবই হলো মুসলমানের কুরান, খ্রিষ্টানের বাইবেল, ইহুদীদের তৌরাত, হিন্দুদের বেদ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, ধর্মগ্রন্থের এই ঈশ্বরের সাথে এই ম্যাগনিফিসেন্ট বিশ্বস্রষ্টার (যদি থাকে) কোনোই সম্পর্ক নেই।

প্রচলিত ধর্মগুলির ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত **ঈশ্বরের জন্মকাল**, বোধ করি, সাত হাজার বছরের বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃতির কাছে অসহায় এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী আমাদের পূর্বপুরুষরা এর বহু হাজার বছর পূর্বেই (আনুমানিক ৩৫-৪০ হাজার বছরের বেশি) ঈশ্বরকে কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের সেই কল্পনার মূলে ছিল **অজ্ঞানতা, অসহায়ত্ব** ও বেঁচে থাকার আকুতি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের সেই কল্পিত ঈশ্বরের ওপর ভরসা করেছেন অনিশ্চিত দৈনন্দিন জীবনের দুরবস্থা থেকে বাঁচার সহায়ক শক্তি জ্ঞানে। এ ছাড়া তাঁরা আর কীই বা করতে পারতেন! **প্রকৃতির বিরূপ রুদ্র রোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার** কিছুই যখন তাদের জানা ছিল না, জানা ছিল না প্রকৃতির বিরূপতাকে অতিক্রম করার কোনো কৌশল, সে মুহূর্তে সেই কল্পনার ঈশ্বরই ছিল তাদের যাবতীয় আশা ভরসার স্থল। বেঁচে থাকার অবলম্বন! সেই পূর্বপুরুষদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা চিরকালই থাকবে। প্রকৃতির বৈরী প্রতিকূলতাকে তারা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই আমরা আজ এখানে! কিন্তু যারা একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের

পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে **মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও বিজ্ঞানের অপব্যাখা করে** ধর্মবাণিজ্য যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখার ব্রতে ব্রতী, তাদের জন্য দুঃখই হয়।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২৩: মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব- এক

সমগ্র কুরানের এক-তৃতীয়াংশ বাক্য শুধুই হুমকি-শাসানি-ত্রাস এবং পুরাকালের নবীদের গল্প সম্পর্কিত। কুরানের মোট ৬২৩৬ টি বাক্যের ৪৭০০ টিরও বেশির জন্মস্থান মক্কায়। মক্কার এই ৪৭০০ টি বাক্যের ১২০০ টিরও বেশি শুধুই পুরাকালের নবীদের উপকথা সম্পর্কিত। অর্থাৎ মক্কায় প্রবক্তা মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তার প্রতি চারটি বাক্যের একটিই হলো পুরাকালের নবীদের গল্প ও কল্পকাহিনী। এই গল্পগুলো প্রচারের সময় স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বারংবার সেই পৌরাণিক নবীদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের উপাখ্যান অবিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিছু উদাহরণ:

## হযরত মুসা (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:

কুরানে মুসা (আঃ) ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরাউনের গল্প কমপক্ষে ২১ বার বর্ণিত হয়েছে। প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহ) বাণীর (কুরান) এক বিশেষ বৈশিষ্ট হলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই বিষয়/বাক্য বার বার প্রদান। হযরত মুসার (আঃ) মোজেজা গুলো ছিল নিম্নরূপ:

## ক) তাঁর লাঠিটি সাপ হয়ে গেল!

৭:১০৪-১০৮- আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং

তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। **তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তাৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।** আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল।

২০:১৯-২২- আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। **অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।**--তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ ছাড়াই।

২৬:৩২-৩৩- **অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।** আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো।

২৭:১০- আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর যখন তিনি তাকে **সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন,** তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না।

২৮:৩১- আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে **লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল,** তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই।

## খ) সমুদ্রের পানি দু'ভাগ হয়ে মাঝপথে শুষ্কপথ নির্মাণ!

২০:৭৭-৭৮- আমি মূসা প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে **সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর।** পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল।

২৬:৬৩- অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে, **তা বিদীর্ণ হয়ে গেল** এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।

২:৫০- আর যখন আমি তোমাদের জন্য **সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি**, অত:পর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে।

## গ) পাথরের ভেতর থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে বারটি প্রস্রবণ তৈরি!

৭:১৬০- আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অত:পর **এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ।** প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ন করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তুত জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর।

২:৬০- আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অত:পর **তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ।**

তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না।

## ঘ) পাহাড়কে সামিয়ানার মত উপরে তুলে ধরা!

২:৬৩- আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং **তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম** এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর।

৪:১৫৪- আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর **তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম** এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আর বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না| এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

৭:১৭১- আর যখন আমি **তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত** এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।

## ঙ) মুসার হাত বগলে রাখার পর তা বের করলে নিরাময় উজ্জ্বল হয়!

২৭:১২- আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, **সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।** এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

২৮:৩২- তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে **নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে** এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

## চ) মৃত মানুষকে জীবিতকরণ!

২:৭৩-৭৪- অত:পর আমি বললাম: **গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন** এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন- যাতে তোমরা চিন্তা কর। অত:পর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অত:পর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে! আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

২:৫৬- তারপর **মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি,** যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও|

## ছ) অলংকারাদির দ্বারা তৈরি বাছুর থেকে অলৌকিক 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ!

৭:১৪৮- আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা **একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা'শব্দ।** তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল| বস্তুত: তারা ছিল জালেম|

## জ) বেহেশতী খাবার পৃথিবীতে আনয়ন!

(৭:১৬০), ২:৫৭- আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং **তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না'ও সালওয়া।**'সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি| বস্তুত: তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে|

**হযরত ইবরাহিম (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:**

কুরানে হযরত ইবরাহিম (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ১২ বার বর্ণনা করা হয়েছে। তার মোজেজা গুলো ছিল নিম্নরূপ:

**ক) অগ্নি অলৌকিকভাবে ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাওয়া!**

২১:৬৯- আমি বললামঃ **হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।**

২৯:২৪- তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। **অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন।** নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

**খ) মৃতকে জীবিতকরণ!**

২:২৬০- আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও| পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অত:পর **সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে।** আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।

## হযরত ঈসা (আ:) ও তার মা মরিয়মের অলৌকিকত্বের বর্ণনা:

### ক) কোলের শিশুর অলৌকিক কথা বলা!

৩:৪৬- **যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন** এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন| আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৫:১১০- যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। **তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও** এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি --

১৯:২৯-৩০- অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? **সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস।** তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।

### খ) কাদামাটি দিয়ে তৈরী পাখিকে জীবনদান ও জন্মান্ধ/কুষ্টরোগী নিরাময়!

৩:৪৯- আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। **আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে।** আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্ হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস| এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৫:১১০- যখন তুমি **কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অত:পর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত** এবং তুমি আমার আদেশে **জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময়** করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অত:পর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

**গ) বেহেশত থেকে খাবার আনয়ন!**

৩:৩৭- অত:পর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন 'মারইয়াম'কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, **'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে।**

৫:১১২-১১৫- যখন হাওয়ারীরা বলল: হে মরিয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন: যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বলল: আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন: হে আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। আল্লাহ্ বললেন: **নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব।** অত:পর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

**হযরত ইউসুফ (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:**

১২:৯৩- তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, **এতে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে।** আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস।

১২:৯৬- অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, **সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন।** বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না?

## হযরত নূহ (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:

২৩:২৭- অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন **নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া** এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জত হবে।

## হযরত সুলায়মান (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:

২৭:১৬-১৭- সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে লোক সকল, **আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে** এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। ’ সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।

## হযরত হূদ (আ:) এর অলৌকিকত্বের বর্ণনা:

১১:৬৪- আর হে আমার জাতি! **আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও,** এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে।

**অন্যান্য অলৌকিকত্বের বর্ণনা:**

২:২৪৩- তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। **তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন।** নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।

২:২৫৯- তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরনের পর একে জীবিত করবেন? **অত:পর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন।** বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে।

>>> অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে পৌরাণিক নবীদের এরূপ অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বারংবার শুনে আসছিলেন। এমতাবস্থায় যে কোনো মুক্তবুদ্ধির বিবেকবান মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মুহাম্মদের কাছে তাঁর **নবুয়তের প্রমাণ** স্বরূপ **"অনুরূপ কোনো অলৌকিকত্ব"**দাবি করতেই পারেন। বিনা প্রমাণে কেন তাঁরা তাঁকে নবী বলে মানবেন? হ্যাঁ, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতই অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের কাছে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হাজির করতে বলেছিলেন। তাঁদের দাবি বেশি কিছু ছিল না। তারা মুহাম্মদের কাছে চেয়েছিলেন মুহাম্মদেরই বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ অলৌকিক কোনো নিদর্শন, যা দেখে তাঁরা নিশ্চিত হবেন যে, মুহাম্মদ সত্যিই আল্লাহের নবী!

মুহাম্মদ কি তা হাজির করতে পেরেছিলেন? মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর আলোকে তার বিশদ আলোচনা করবো পরবর্তী পর্বে।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২৪: মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব- দুই

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রচারণায় সুদীর্ঘ ২৩ বছর (৬১০-৬৩২) পৌরাণিক নবীদের অলৌকিক মোজেজার কাহিনী অবিশ্বাসীদের শুনিয়েছেন। এমতাবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছেও তার **"নবুয়তের প্রমাণ"** হাজির করতে বলেছিলেন। বিনা প্রমাণে কোনো সুস্থ বিবেকবান মুক্ত-বুদ্ধির মানুষই কাউকে নবী হিসাবে মেনে নিতে পারেন না। অবিশ্বাসীরাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কী প্রমাণ দাবী করেছিলেন এবং প্রতি-উত্তরে মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁদের কী জবাব দিয়েছিলেন, কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি বিষয় পাঠকদের অবহিত করতে চাই। আর তা হলো:

## কুরাইশরা ছিলেন "আল্লাহ বিশ্বাসী"!

কুরাইশরা যে বংশ পরম্পরায় "আল্লাহ"-কে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করতেন, তার জাজ্বল্য প্রমাণ হলো মুহাম্মদের পিতার নাম! আবদ-আল্লাহ (আবদুল্লাহ)! অর্থাৎ আল্লাহর দাস। ইসলামের জন্মের বহু আগে থেকেই আবদ মানাফ, আবদ উজ্জাহ, আবদ আল্লাহ (দেবতা মানাফ, উজ্জাহ ও আল্লাহর দাস) ইত্যাদি নামগুলো আরবে বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়াও, মুহাম্মদ তার নিজেরই জবানবন্দিতে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তৎকালীন কুরাইশরা ছিলেন আল্লাহ বিশ্বাসী! মুহাম্মদের ভাষায়:

২৩:৮৪-৮৯- বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল।

**এখন তারা বলবে: সবই আল্লাহর।**

বলুন: সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে?

**এখন তারা বলবে: আল্লাহ।**

বলুন: তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না?

**এখন তারা বলবে: আল্লাহর।**

৩১:২৫- আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে?

**তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।**

৩৪:৭-৮- কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পুর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। **সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উম্মাদ** এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

৩৯:৩৮- যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে?

**তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ।**

৪৩:৯- আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে?

**তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।**

৪৩:৮৭- যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, **তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।**

>>> ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরাইশরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যখন মুহাম্মদ তাঁদের পূজনীয় পিতৃপুরুষ ও উপাস্য দেবতাদের অসম্মান-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা শুরু করেছিলেন! তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, **"মুহাম্মদ তাদের দেবতা 'আল্লাহর'নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছেন, তাঁদের আল্লাহকে কলঙ্কিত করছেন।"**তার আগে কুরাইশরা কখনোই মুহাম্মদের প্রচারণায় কোনরূপ বাধা-প্রদান করেননি (বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়ামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে)।

মুহাম্মদ তাঁর প্রচারণায় শুরু থেকেই পূর্ব-বর্তী নবীদের অলৌকিক শক্তির (মোজেজা) বর্ণনা অবিশ্বাসীদের বারংবার স্মরণ করিয়ে হুমকি ও হুশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন। তাই, মুহাম্মদ যখন নিজেকে পূর্ববর্তী নবীদের ধারাবাহিকতার শেষ নবী বলে ঘোষণা দিয়ে তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানালেন, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের কাছে তাঁর নবুয়তের যথার্থতার প্রমাণস্বরূপ তাঁরই উদ্ধৃত **"পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ কোন অলৌকিক নিদর্শন (মোজেজা)"** বহুবার বিভিন্নভাবে হাজির করার আহ্বান জানিয়েছিলেন! যা দেখে তাঁরা নিশ্চিত হবে যে, মুহাম্মদ সত্যিই একজন নবী, ভণ্ড নন! খুবই যুক্তিসম্মত দাবি। প্রতি-উত্তরে মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন এবং কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জীবনীগ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কিছু উদাহরণ:

### ১) পূর্ববর্তী নবীগনের অনুরূপ কোন নিদর্শন আনয়নের দাবী

**১৭:৯০- ৯৭**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

**“এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি** ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন। **আপনি যেমন বলে থাকেন,** তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব।”

**মুহাম্মদের জবাব:**

“বলুনঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? **আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে,** যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। বলুনঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গাম্বর করে প্রেরণ করতাম। বলুনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন।”

**তারপর হুমকি -শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন!**

“আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। **আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ**

**অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম।** যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব।"

>>> অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদের জবাব কি আদৌ প্রাসঙ্গিক? মুহাম্মদ নিজেই অসংখ্যবার দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীরা তাঁদের নবুয়তের 'প্রমাণ' এনেছিলেন। সে কারণে কুরাইশরাও মুহাম্মদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে **("আপনি যেমন বলে থাকেন-")** সে সকল নবীদের অনুরূপ মোজেজা হাজির করে তাঁর দাবির যথার্থতা প্রমাণের দাবী জানিয়েছিলেন। জবাবে আল্লাহর "লেবাসে" মুহাম্মদের সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক জবাব! মুহাম্মদ নিজেই দাবি করেছেন যে, তাঁর কাছে ফেরেশতারা আগমন করে। অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে তাঁর সেই ফেরেশতাদেরকেই দেখানোর আহ্বান জানাচ্ছেন! এটা কি কোন অযৌক্তিক দাবি? আর, "আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন?' এই উক্তিটির মধ্যে কী এমন গর্হিত অন্যায় আছে, যা অবিশ্বাসীদের ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে?

**২১:৫-৬**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

"এছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। **অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শন সহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগন।"**

**জবাবে মুহাম্মদের হুমকি:**

**"তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি,** তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে?"

**২০: ১৩৩- ১৩৪**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

“এরা বলেঃ **সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?”**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

**“তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম,** তবে এরা বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।”

>>> মুহাম্মদের প্রচারণার শুরু থেকেই তার চারপাশের প্রায় সমস্ত জনগণ মুহাম্মদের যাবতীয় গল্প-কাহিনীকে পুরাকালের উপকথা বলে অভিযোগ করে এসেছেন। পূর্ববর্তী নবীরা যে 'মোজেজা' দেখিয়েছিলেন, এরূপ পৌরাণিক উপকথা ও কিচ্ছা-কাহিনী তাঁরা মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই বংশপরম্পরায় শুনে এসেছেন। কুরাইশদের কাছে এ তথ্যগুলো নতুন নয় (বিস্তারিত সপ্তদশ পর্বে)।

মুহাম্মদ দাবী করেছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ একজন নবী। সে কারণেই কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছেও অনুরূপ প্রমাণ হাজির করার দাবি জানাচ্ছেন, "দেখাও অনুরূপ একটি মোজেজা এবং প্রমাণ করো তুমি তাদের মতই একজন!" জবাবে, "তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে?" জবাবটি কি আদৌ

কোনো অর্থ বহন করে? জবাবটি কি আদৌ প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই নয়! **অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মুহাম্মদ পৌরাণিক কিচ্ছা-কাহিনীরই পুনরুল্লেখ করে 'প্রমাণের পরিবর্তে দিচ্ছেন হুমকি'!**

**৬:৩৭**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

"তারা বলে: **তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

বলে দিন: **আল্লাহ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ন সক্ষম;** কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

**১০:২০**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'বস্তুতঃ তারা বলে, **তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন?**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

'বলে দাও **গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন।** আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম"

**১৩:৭**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

‘কাফেররা বলেঃ **তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন?**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

**আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই** এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে।

**২৯:৫০**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

‘তারা বলে, **তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন?**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

‘বলুন, **নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন।’**

>>> পাঠক, একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন। কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছে বারংবার তাঁর “নবুয়তের প্রমাণ" হাজির করতে বলেছেন। মুহাম্মদের ঘোষিত পালনকর্তা যে অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, সবজান্তা (গায়বের কথা জানেন), অসীম ক্ষমতাধর (যা ইচ্ছা তাইই করতে পারেন)- এ দাবিগুলো স্বয়ং মুহাম্মদের, কুরাইশদের নয়।

তথাপি মুহাম্মদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে কোনো নিদর্শন (মোজেজা) কেন অবতীর্ণ হয়নি, সেটাই ছিল কুরাইশদের প্রশ্ন! কুরাইশরা মুহাম্মদকে তাঁর সেই দাবিরই

যথার্থতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন! আর মুহাম্মদ প্রতিবারই **প্রমাণের পরিবর্তে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক জবাব** দিয়ে চলেছেন!

**৬:১০৯-১১১**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

**'তারা জোর দিয়ে আল্লাহর কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে।'**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি:**

'আপনি বলে দিন: নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই আছে। **হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই? আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে,** যেমন-তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।'

**>>> কুরাইশরা তাদের দেবতা "আল্লাহর কসম" খেয়ে বলছেন যে, যদি মুহাম্মদ কোনো 'অলৌকিকত্ব' দেখাতে পারেন, তবে তাঁরা মুহাম্মদকে বিশ্বাস করবেন।** মুহাম্মদ তা দেখাতে সক্ষম তো হনই নাই, উল্টা অভিযোগ করছেন, "কে বলল যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই?" বড়ই অদ্ভুত! আবারও সেই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই আছে" - হ্যাঁ, এ দাবিটি মুহাম্মদের। **কুরাইশরা মুহাম্মদের এই দাবিটিরই "প্রমাণ"দাবী করেছেন!** তারপরের অংশটি (হুমকি) আরও অপ্রাসঙ্গিক! অপারগ অক্ষম মুহাম্মদ প্রমাণের পরিবর্তে দিচ্ছেন হুমকি, "আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে -- আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।"

মুহাম্মদ নিজেই নিজেকে পূর্ববর্তী নবীদেরই অনুরূপ একজন নবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর সেই দাবির সপক্ষে অবিশ্বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নবুয়তের প্রমাণ দাবি করেছিলেন। এটা কি কোনো অপরাধ? কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের এহেন যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে **উল্টাপাল্টা অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি প্রদর্শনকারীকে কি বিবেকবান, নীতিপরায়ণ, যুক্তিবাদী, সভ্য বা উদার বলা যায়?** ভুললে চলবে না যে, মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসীদেরকে অন্ধকারের অধিবাসী (আইয়ামে জাহিলিয়াত) বলে অনবরত তাচ্ছিল্য করেন।

**১১:১২**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

"---তাদের এ কথায় যে, **তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি?** অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন"?

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

**"তুমি তো শুধু সতর্ককারী মাত্র;** আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন"।

**২৮:৪৮-৪৯**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

"অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, **মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সেরূপ দেয়া হল না কেন"?**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

"পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। বলুন, **তোমরা**

**সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব আন,** যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।"

>> কী অদ্ভুত! নবুয়তের দাবিদার হলেন মুহাম্মদ, কুরাইশরা নয়। দাবীদার তার দাবির যথার্থতার প্রমাণ হাজির করার পরিবর্তে অস্বীকারকারীদের কাছেই "প্রমাণ দাবি" করছেন!

পাঠক, মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! **"বলুনঃ --একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (১৭: ৯৬), আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম (১০:২০), তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র (১১:১২)"**—ইত্যাদি আপাত সহনশীল বাণী মুহাম্মদের মক্কা জীবনের। যখন তিনি ছিলেন অক্ষম, অপারগ ও দুর্বল! মদিনায় শক্তিমান মুহাম্মদের বাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কুরান পাঠের সময় আয়াতের জন্মস্থানের বিষয়টি খেয়াল না রাখলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

## ২) সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ করানোর দাবি

**অবিশ্বাসীদের অভিযোগ:**

২৫:৪- "কাফেররা বলে, **এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে।** অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।"
২৫:৬৭-৬৮- "কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। **এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়।"**

**৪:১৫৩**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

“আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর **আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন।”**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি:**

“বস্তুত: এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে| বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্কে দেখিয়ে দাও| অতএব, **তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে** তাদের পাপের দরুন; অত:পর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম”।

**২৫:৩২**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

“সত্য প্রত্যাখানকারীরা বলে, **তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন?”**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

“আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি **আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে।”**

>>> অবিশ্বাসীরা সর্বদাই অভিযোগ করতেন যে, মুহাম্মদ যা কিছু প্রচার করতেন, তা পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ আর কিছুই নয় - যা তাঁরা বহু আগে থেকেই শুনে আসছেন। তাঁরা অভিযোগ করতেন যে, মুহাম্মদ 'নিজেই কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও

তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্যে করেছে।' মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন যে, সমগ্র কুরান বহু আগেই থেকেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর কাছে গচ্ছিত আছে। মুহাম্মদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের দাবি, "যদি তাইই হয় তবে সমগ্র কুরান একসঙ্গে হাজির করো না কেন?" **মুহাম্মদ তা হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন।**

**২৯:৫০-৫৩**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

"তারা বলে, **তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন?"**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

"বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। **এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়।** এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। **নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না।"**

>>> অবিশ্বাসীরা বারংবার অভিযোগ করে আসছেন যে, মুহাম্মদ নিজেই কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। সেই অভিযোগের প্রশ্নে মুহাম্মদের জবাব, "এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি-"! অর্থাৎ, মুহাম্মদের 'কিসসা-কাহিনী-হুমকি-শাসানি- তাচ্ছিল্য-ভীতি

প্রদর্শন' সম্বলিত পুস্তকটিই মুহাম্মদের নবুয়তের সাক্ষী! তার আর কোন প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন নেই। কী অদ্ভুত যুক্তি!

## ৩) কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?

**৭:১৮৭-১৮৮**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

“আপনাকে জিজ্ঞেস করে, **কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?”**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

“বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, **এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে।** কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

**৬৭:২৫-২৯**

**প্রশ্ন**

‘কাফেররা বলেঃ **এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে,** যদি তোমরা সত্যবাদী হও?’

**মুহাম্মদের জবাব ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

‘বলুন, **এর জ্ঞান আল্লাহ তা’আলার কাছেই আছে।** আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে।’

**৭৯:৪২-৪৪**

**প্রশ্ন:**

'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, **কেয়ামত কখন হবে?'**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

'এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? **এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে।** যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।'

**১০:৪৮-৫০**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'তারা আরো বলে, **এ ওয়াদা কবে আসবে,** যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

'**তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই**, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদন্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে। - তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তার আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে'?

**২১:৩৮-৪৬**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'এবং তারা বলেঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে **এই ওয়াদা কবে পুর্ণ হবে?**

**মুহাম্মদের অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক জবাব, তাচ্ছিল্য ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

'যদি কাফেররা ঐ সময়টি জানত, **যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।** বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিত ভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। বলুনঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্বার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুস্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? বলুনঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম।

**২৭:৭১-৭২**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, **এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে?**

**মুহাম্মদের জবাব:**

বলুন, **অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে।**

**৩২:২৮-২৯**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; **কবে হবে এই ফয়সালা?**

**মুহাম্মদের হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

'বলুন, **ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশ ও দেয়া হবে না।'**

**৩৪:২৯-৩০**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, **এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?**'

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

"বলুন, **তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিত ও করতে পারবে না।**"

**৩৬:৪৮-৫০**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল **এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে'?**

**মুহাম্মদের হুমকি:**

'তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, **যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতন্ডাকালে। তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না।** এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।'

**৫১:১২-১৪**

**প্রশ্ন:**

‘তারা জিজ্ঞাসা করে, **কেয়ামত কবে হবে’?**

**মুহাম্মদের হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন:**

**“যেদিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর।** তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল।’

**৩৩:৬৩-৬৮**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

‘**লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।’**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি:**

‘**বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই।** আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটেই। **নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।** তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়। আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।’

>>> কিয়ামতের হুমকি/দাবি মুহাম্মদের। কুরাইশরা মুহাম্মদের সে দাবীরই যথার্থতার প্রমাণ জানতে চাইছেন, "কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?" বরাবরের মতই উল্টা-পাল্টা

অপ্রাসঙ্গিক জবাব, হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মুহাম্মদ তার **"অক্ষমতা ও অপারগতার প্রমাণ"** হাজির করেছিলেন। সে কারণেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা মুহাম্মদকে **প্রতারক, জালিয়াত, ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী** রূপে আখ্যায়িত (বিস্তারিত সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং বাইশতম পর্বে) করেছিলেন। তাঁরা কি কোনো গর্হিত অপরাধ করেছিলেন?

পাঠক, বাস্তব ব্যক্তি জীবনের অনুরূপ পরিস্থিতিতে (কল্পনা করুন) এহেন স্পেশাল দাবিদার কোনো 'স্বঘোষিত নবী-আউলিয়া-পীর-কামেল-সাধুবাবার' দাবিকে আপনারা কুরানে বর্ণিত ওপরোক্ত সওয়াল-জবাবের মাপকাঠিতে কীভাবে মূল্যায়ন করতেন? অকাট্য সত্যবাদী রূপে? নাকি ভণ্ড-প্রতারক রূপে?

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

# ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে! ২৫: মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব- তিন

প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অভূতপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এ বিশ্বাস যে শুধুই এক ভিত্তিহীন অসত্য অতিকথন (Only a Myth), তা অতি সহজেই প্রমাণিত হয় মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জীবনী (Psycho-biography) গ্রন্থের পর্যালোচনায়। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো এই গ্রন্থটি (কুরান); এই সেই গ্রন্থ যে গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রবক্তা স্বয়ং মুহাম্মদ (আল্লাহ) এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এই দলিলেরই আলোকে কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ যৌক্তিক দাবি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব, হুমকি, শাসানী, তাচ্ছিল্য ও ভীতি প্রদর্শনের আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। কুরাইশ/অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের সাক্ষ্য রূপে আরও যে সমস্ত প্রমাণ হাজির করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ:

## (৪) আযাব ত্বরান্বিত করার আহ্বান

**২২:৪৭-৪৮**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

**"তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে।"**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ভীতি প্রদর্শন:**

“অথচ **আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।** আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। -এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল। **এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি** এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।”

>>> আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি করেন না, সে প্রশ্ন তো কুরাইশরা এখানে করেননি বা জানতেও চাননি। কুরাইশরা মুহাম্মদের নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ তাঁর আল্লাহর "আযাব ত্বরান্বিত করতে" আহ্বান করেছিলেন।

**২৯:৫৪-৫৫**

**অবিশ্বাসীদের দাবী ও মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি:**

“তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; **অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে।** যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ বললেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।”

**৮:৩১-৩৪**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

“আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই -- তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, **ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর।”**

**মুহাম্মদের জবাব ও হুমকি:**

“অথচ **আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে** আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।”

>>> **"আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন"**- যদি তাইই হয়, তবে কেন মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদেরকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে অভিশাপ, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন? ইমাম বুখারীর ভাষ্য মতে উক্ত আয়াতের শানে নজুল হলো আবু জেহেলের এক উক্তি! **(৬:৬০:১৭১)**

“আনাস বিন মালিক হতে উদ্ধৃত;

আবু জেহেল বলেছিলেন, ‘হায় আল্লাহ! এই (কুরান) যদি তোমার সত্য ভাষণের নমুনা হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ কর অথবা পাঠাও কোন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।’ তাই আল্লাহ নাযিল করলেন’, --কিন্তু আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন, --(৮:৩৩-৩৪) "  - অনুবাদ লেখক

“Narrated Anas bin Malik: -- Abu Jahl said, "O Allah! If this (Quran) is indeed the Truth from You, then rain down on us a shower of stones from the sky or bring on us a painful torment."

So Allah revealed:-- "But Allah would not punish them while you were amongst them --".

আল্লাহর নামে মুহাম্মদের উল্টা-পাল্টা, অবান্তর, উদ্ভট ও হাস্যকর বাণী যে কোনোভাবেই স্রষ্টাপ্রদত্ত হতে পারে না, এ ব্যাপারে আবু জেহেল ছিলেন একেবারেই নিশ্চিত। তাই তিনি মুহাম্মদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন! এর পরের অংশটি, **"যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে--"** একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক! প্রশ্নকারী মুহাম্মদের (আল্লাহ) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাচ্ছেন, এমন আলামত কি কোথাও ব্যক্ত করেছেন? অবশ্যই নয়! তাহলে? **এহেন উদ্ভট ও অপ্রাসঙ্গিক জবাবের হেতু যে অপারগতা ও অক্ষমতা, তা বোঝা যায় অতি সহজেই!**

"অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই" - **মুহাম্মদ কুরাইশদের বিরুদ্ধে এ সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, বিষোদগার ও জ্বালাময়ী বক্তব্য শুরু করেছিলেন মদিনায় এসে।** কীসের প্রয়োজনে?

১) রাতের অন্ধকারে বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার ওপর মুহাম্মদ ও তার সন্ত্রাসী/ডাকাত বাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে কুরাইশদের সর্বস্ব লুট (ডাকাতি), আরোহীকে খুন অথবা বন্দী করে নিয়ে এসে তাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার যে লাভজনক **"অনৈতিক জীবিকাবৃত্তি"**মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা শুরু করেছিলেন, তারই **"বৈধতা"** দেয়ার প্রয়োজনে!

**২) তার সন্ত্রাসী/ডাকাত বাহিনীর এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধে (বদর যুদ্ধ) মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনী তাদেরই একান্ত**

**নিকটাত্মীয়, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যে বর্বর-অমানুষিক-নৃশংসতার চূড়ান্ত উদাহরণ রেখেছিলেন, তারই বৈধতা দেয়ার প্রয়োজনে!**

৩) তার মক্কাবাসী সহচরদের (মুহাজির) তাদেরই আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রয়োজনে!

৪) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় সন্ত্রাসী হামলা-খুন ও রাহাজানিকে বৈধতা দেয়ার প্রয়োজনে!

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়ামে জাহিলিয়াত ও হিজরত তত্ত্বে।

## (৫) ফেরেশতাদেরকে দেখানোর দাবী

**৬: ৮-৯**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

'**তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না?**'

**মুহাম্মদের হুমকি/ভীতি প্রদর্শন:**

'যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। **অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না।** যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত| এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে।'

**৬:১৫৮**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

‘তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে **ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন** অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে।’

**মুহাম্মদের ভীতি প্রদর্শন:**

“**যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না,** যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন: তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথে দিকে তাকিয়ে রইলাম।”

**১৫:৭-৮**

**অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন:**

“--যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে **আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন?”**

**জবাবে ভীতি প্রদর্শন:**

“-- আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফায়সালার জন্যেই নাযিল করি। **তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।’**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

‘যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, **আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন?**

**মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

**“তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।”**

>>> অবিশ্বাসীদের দাবি ও প্রশ্ন ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু প্রবক্তা মুহাম্মদের সমস্ত জবাবই অপ্রাসঙ্গিক। এ সমস্ত উদ্ভট পাল্টা দাবি/জবাবের মাধ্যমে মুহাম্মদ যে তাঁর **অপারগতা ও অক্ষমতাই** প্রমাণ করেছিলেন, তা বোঝা যায় অতি সহজেই।

## (৬) আল্লাহ্ কোনো মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি

**৬:৯১**

**অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস:**

"তারা আল্লাহ্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল: **আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।"**

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

"আপনি জিজ্ঞেস করুন: **ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল?** যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিন: আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। অত:পর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।"

>>> মুসা মানুষ ছিলেন এবং কুরাইশরা (আয়াতটি মক্কায়) মুসার অনুসারী ছিলেন না। অবিশ্বাসীরা যেখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলছেন যে, "আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি।" তার জবাবে, "ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল" প্রশ্নটি **একেবারেই অবান্তর।**

## (৭) "প্রমাণ চাই, প্রমাণ!"

**৪৫:২৫-২৬**

**অবিশ্বাসীদের দাবী:**

“তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন মুক্তিই থাকে না যে, **তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে আস।**”

**অপ্রাসঙ্গিক জবাব:**

“আপনি বলুন, **আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন,** যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।”

## অবশেষে মুহাম্মদের স্বীকারোক্তি:

**৭:১৮৮**

“আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। **আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না।** আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।”

**৬:৫৭**

“আপনি বলে দিন: আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। **তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই।** আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না।”

**এবং, "আঙুর ফল টক" ও আরও গালি/তাচ্ছিল্য!**

**৬:১১১**

“আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, **তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়**; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু **তাদের অধিকাংশই মুর্খ।**”

>>> ওপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো অবিশ্বাসীরা বহুবার বিভিন্নভাবে মুহাম্মদকে তার নবুয়তের প্রমাণ হাজির করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ প্রতিবারেই প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আশ্চর্যজনক হলেও কুরানের আলোকে নিরপেক্ষ বিচারে এ সত্যটাই স্পষ্ট। কিন্তু সমস্ত মুসলিম সমাজ এ সত্য মানতে নারাজ। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন "সুপার-হিউম্যান।" যে কোনো মসজিদ এবং মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে “মুহাম্মদের অলৌকিকত্বের" উদাহরণ হিসাবে যে বয়ানগুলো বারংবার শোনানো হয়, তা হলো নিম্নরূপ:

## মক্কায় মুহাম্মদ (৫৭০-৬২২ সাল)

## মুহাম্মদের সশরীরে মুহূর্তে আকাশভ্রমণ (মেরাজ) আর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ!

**মেরাজ!**

১৭:১– “পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, **যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত** - যার চার দিকে আমি

পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।"

১৭:৬০– "--স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং **যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ** কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।"

৫৩:১৩-১৮– "নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল।তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।"

>>> একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ/নক্ষত্র/গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে যখন একদল মানুষের সাথে **"১৪০০ বছর আগের এক আরব বেদুইন আলোর ধ্রুব গতিকে (speed of light is constant = 1,86,000 miles/second) কাঁচকলা দেখিয়ে স্ব-শরীরে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী স্থানে 'মুহূর্তের মধ্যে' পরিভ্রমণ শেষে আবার সশরীরে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন কি না,** কিংবা সেই একই ব্যক্তির অঙ্গুলি হেলনে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছিল কি না - তা নিয়ে বিতর্কে নামতে হয়, তখন তা হয় অতীব লজ্জাকর এক পরিস্থিতি! বিশ্বাস (perception with no evidence) মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা ও

বিশ্লেষণ শক্তিকে যে কী পরিমাণ "ভোঁতা" করতে পারে, তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়!

একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে, মস্তকের চুল থকে শুরু করে পায়ের তালু এবং শৌচাগার থেকে শুরু করে মহাশূন্য পর্যন্ত বিজ্ঞানের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করেও যে সকল সুবিধাবাদী ধর্মবাজরা বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে কুযুক্তির মাধ্যমে ৭ম শতাব্দীর এক মানব সন্তানের যাবতীয় বাণী ও উদ্ভট দাবীর **"বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা"** হাজির করে প্রতিনিয়ত সাধারণ ধর্মপ্রাণ অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন; তাদের এই কুৎসিত কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। ধর্ম বিষয় বিতর্কে এই অধ্যায়টিতে আমি চরম বিরক্তি বোধ করি। হতাশা বোধ করি। সপ্তম শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এক আরব বেদুইনের উদ্ভট দাবিকে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই না করে আমি তাঁর দাবিকে **তাঁরই সময় ও পরিবেশের আলোকে বিচার** করাকেই শ্রেয় ও যথার্থ মনে করি।

কুরানের আলোকে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো প্রবক্তা মুহাম্মদের ঘোষণা অনুযায়ী এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল **"রাত্রি বেলায়।"** অবিশ্বাসীরা তো নয়ই, কোনো প্রত্যক্ষদর্শী মুহাম্মদ অনুসারীও সেখানে ছিলেন না। **মুহাম্মদের এই অলৌকিকত্বের দাবিদার মুহাম্মদ, সাক্ষীও সেই একই ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবদ-আল্লাহ!** ঘটনাটি ৬২১ সালের। হিজরতের অল্প কিছু দিন আগে। প্রশ্ন হলো, যে মুহাম্মদ সুদীর্ঘ ১২ বছরে (৬১০-৬২১) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বারংবার তাগাদা সত্বেও একটি প্রমাণও (মোজেজা) হাজির করতে পারেননি; যে মুহাম্মদ দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বছরের পরে বছর যাবত প্রমাণের পরিবর্তে যাদেরকে শুনিয়েছেন **অপ্রাসঙ্গিক জবাব;** যে মুহাম্মদ সুদীর্ঘ এক যুগ অবধি কুরাইশ ও তাদের পূর্বপুরুষ/পূজনীয় দেবদেবীকে করেছেন উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, দিয়েছেন হুমকি, করেছেন ভীতি প্রদর্শন (বিস্তারিত পরবর্তী

পর্বে); যে জনগোষ্ঠী মুহাম্মদ ইবনে আবদ-আল্লাহকে (আবদুল্লাহ) চিনে এসেছেন এক মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও জালিয়াত হিসাবে; সেই একই জনগোষ্ঠী কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ছাড়া রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি মুহাম্মদের আকাশ ভ্রমণ (মেরাজ)-এর এহেন উদ্ভট ও হাস্যকর দাবিকে কী কারণে বিশ্বাস করবেন? **এহেন সর্বজনবিদিত মিথ্যাবাদী-ভণ্ড-প্রতারকের দাবি তো নয়ই, কোনো চরম সত্যবাদী মানুষেরও এহেন উদ্ভট দাবিকে কি কোনো সুস্থ-বিবেকবান মুক্তচিন্তার মানুষ বিশ্বাস করতে পারেন?** এহেন উদ্ভট 'কিসসা কাহিনীর' অবতারণা করে কুরাইশ/অবিশ্বাসীদেরকে তা বিশ্বাস করার আহ্বান জানানোকে **"সীমাহীন তামাসা**"বলে আখ্যায়িত করা কি আদৌ অযৌক্তিক? মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ কুরাইশরা কেন তাঁকে **"উন্মাদ"** রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় এহেন উদ্ভট, অবাস্তব, বাস্তবতাবর্জিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই!

"মেরাজ" নিয়ে **মুক্তমনায় বেশ কিছু সমৃদ্ধ লেখা আছে।** উৎসাহী পাঠকরা সে সমস্ত লেখা থেকে মেরাজের দাবির অসারতার অনেক প্রমাণ অনায়াসেই জানতে পারবেন।

**চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ!**

**৫৪:১- কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।**

ব্যস! কুরানের এই "একটি মাত্র আয়াত।"এই একটি মাত্র বাক্যকে মনের মাধুরী মিশিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদরা গত ১৪০০ বছর ধরে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়েছেন যে, পৃথিবীতে এমন একজন মুসলমানও বোধ করি পাওয়া যাবে না (ও ছিল না), যে মুহাম্মদের এই 'অলৌকিক ঘটনার' কথা শোনেনি। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মানদণ্ডে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতের ঘটনাটি এতই অবাস্তব যে **"বুদ্ধিমান"তাফসীরকারদের অনেকেই এ ঘটনাটি আদৌ বাস্তবে কখনো ঘটেছিল বলে মনে করেন না। তারা মনে করেন কেয়ামতের আগে এ ঘটনাটি ঘটবে!**

## স্বচক্ষে 'তাদেরকে'দ্বিগুন দেখছিল! আসমান থেকে ঘোড়ার পিঠে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ!

৩:১৩– "নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের **এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল।** আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।"

৮:৪৩-৮:৪৪– " আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। আর যখন **তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে বেশী,** যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায়।"

>>> সাক্ষী কে? আবার সেই একই কিচ্ছা! দাবিদার ও সাক্ষী একই ব্যক্তি! মুহাম্মদের এহেন দাবিকে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করার কোনোই হেতু নেই!

৩:১২৪-৩:১২৫- "আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশ্তা পাঠাবেন। -অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি

তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে **তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।"**

৯:২৬– " তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং **অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের** এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।"

>>> এক দিকে মুহাম্মদের দাবি: আল্লাহ **"হও বললেই তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়!**['কুন ফা ইয়া কুন'(৩৬:৮২)], অন্য দিকে তাঁর আরেক দাবী: আল্লাহ আকাশ থেকে কাফের নিধনের জন্য **"খুনি ক্যাডার বাহিনী"** প্রেরণ করেন! কেন? "হও" তে কি আর কাজ হয় না! এই খুনি ক্যাডার বাহিনী ছাড়া কি আজরাইল (যমদূত) কাফেরদের জান কবজ করতে বিফলকাম হয়েছিলেন? সে কারণেই কি যমদূতকে সাহায্যের জন্য একটি বা দু'টি নয়, ৩০০০-৫০০০ ফেরেশতাকে মাঠে নামাতে হয়েছিল? তামাসার শেষ সীমা! আগের মতই মদিনার এসব অলৌকিকত্বের দাবীদার স্বয়ং মুহাম্মদ। সাক্ষীও তিনি। **কোনো অবিশ্বাসী ও সাধারণ জনগণ এ ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী কখনোই ছিলেন না।**

**মুহাম্মদের সমসাময়িক মানুষগুলো মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ না করার সপক্ষে আরও যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ:**

৪৫:৩২– "- যখন বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে **আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।**"

>>> **"আমরা কেবল ধারণাই করি, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই**"- এর চেয়ে বড় সত্য আর কি কিছু হতে পারে?

৪৫:২৪- "তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; **আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।** তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।"

>>> এতে কী কোনো সন্দেহ আছে? অমোঘ মহাকালকে কে অতিক্রম করতে পারে?

৪৩:২০- "তারা বলে, রহমান **আল্লাহ ইচছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না।"**

>>> মুহাম্মদ অসংখ্যবার দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই সাধিত হয় না (পর্ব-২০)! তাঁর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন! তাঁর সে দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের জবাব কি আদৌ অযৌক্তিক?

৪৩:২২- "বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।"

>>> পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই তার পৈতৃক ধর্মকেই অকাট্য জ্ঞান করে! কুরাইশরাও তাই করেছিলেন।

স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

## মুহাম্মদের মোজেজা তত্বের সংক্ষিপ্তসার:

১) অবিশ্বাসীরা বহুবার বিভিন্নভাবে মুহাম্মদকে তাঁর **নবুয়তের প্রমাণ** হাজির করতে বলেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ও দাবি ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক। বিনা প্রমাণে কেন তাঁরা

মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মেনে নেবেন? বিশেষ করে যখন মুহাম্মদের প্রচারে তাঁরা কোনো নতুনত্বই খুঁজে পাননি ('পুরাকালের উপকথা'!)?

২) প্রবক্তা মুহাম্মদের সমস্ত জবাবই ছিল **অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বিনিময়**। মুহাম্মদ তাঁর নবুয়তের সপক্ষে শুধু যে কোনো প্রমাণই হাজির করতে পারেননি, তাইই নয়, **তাঁর জবাবে ছিল তাচ্ছিল্য, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন।** ফলস্বরূপ মক্কার সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের নবী জীবনে ১২০-১৩০ জনের বেশি মানুষকে তাঁর অনুসারী করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর সেই অনুসারীদের প্রায় সবাই ছিলেন সমাজের নিম্নশ্রেণীর। কিছু ছিল তার পরিবার সদস্য। কিছু তার আত্মীয়-স্বজন। আবু বকর ও ওমর ছাড়া আর কোনো বিশিষ্ট কুরাইশই সে তালিকায় ছিলেন না। একমাত্র খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ (স্ত্রী) এবং হামজা ইবনে আবদ-আল মুত্তালিব (চাচা, মুহাম্মদের সমবয়েসী) ছাড়া তাঁর পরিবারের কোনো **ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ** তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করার কোনো কারণই খুঁজে পাননি। ইসলাম গ্রহণকালে আলী ছিলেন মুহাম্মদেরই পোষ্য, নয় বছর বয়েসী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক!

৩) ইসলামী এমন একটি মাধ্যমও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে অবিশ্বাসীদের জনজীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়। বিশেষ করে মুহাম্মদের সমকালীন সমাজের লোকদের। তাচ্ছিল্যভরে তাদেরকে বলা হয় 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' (অন্ধকারের যুগ)। 'আইয়্যামে জাহেলিয়্যাত' অপবাদ দিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের যতই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুন না কেন, **সত্য হচ্ছে কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন, দাবি ও যুক্তিগুলো ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক। তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না।**

৪) **মুহাম্মদ পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ** [যা সকলেই দেখতে পায় যেমন মুসার লাঠি সাপ হয়ে বিচরণ বা পাথরের থেকে বারটি প্রস্রবণ অথবা ঈসার কাদামাটি দিয়ে তৈরি

পাখিকে জীবন দান ও জন্মান্ধ/কুষ্টরোগী নিরাময়! যা সকলেই শুনতে পায় যেমন মাটির বাছুরের হাম্বা-হাম্বা শব্দ! যা সকলেই খেতে পায় (মান্না-সালওয়া) - ইত্যাদি (পর্ব -২৩)] **"অলৌকিকত্ব" কখনোই হাজির করতে পারেননি।**

**মুহাম্মদের যাবতীয় "মোজেজার কিসসা" ইসলামের হাজারো মিথ্যাচারের একটি। সত্য হলো, কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বারংবার আহ্বান সত্বেও মুহাম্মদ তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি প্রমাণও হাজির করতে পারেননি! Not a single one!**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৯৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা হয়ত এটাই প্রথম।

**এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *প্রথম ইবুক।***

**নরসুন্দর মানুষ**


dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net


**দ্বিতীয় খণ্ড আসছে দ্রুত**
**চোখ রাখুন ধর্মকারী-তে**